স্বস্তিকা

৬৫ বর্ষ, ১৫ সংখ্যা।। ৩ ডিসেম্বর - ২০১২।। ১৭ অগ্রহায়ণ - ১৪১৯ ।। দাম : সাত টাকা

ইউ পি এ বিদায় কোন পথে?

বিপন্ন ভারতীয় অর্থনীতি

— অম্লানকুসুম ঘোষ

পৃষ্ঠা ১১

অসম আজ কোন দিশায়?

— হরিমোহন দাস

পৃষ্ঠা ৩০

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫
সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৭
বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের দাপটে অসমে
অস্তিত্বের সংকটে সবক'টি জনগোষ্ঠী ▯ ৮
খোলা চিঠি : লজ্জা নারীর ভূষণ, নির্লজ্জতা কংগ্রেসের ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৯
মমতার কর্মকাণ্ডে সুবিধা হচ্ছে কংগ্রেস-সিপিএমেরই ▯ ১০
বিপন্ন ভারতীয় অর্থনীতি ▯ অম্লানকুসুম ঘোষ ▯ ১১
ইউ পি এ সরকারকে অপসারণ করব কীভাবে? ▯ ডঃ সুব্রহ্মনিয়াম স্বামী ▯ ১৪
মনমোহন সিং কি পারবেন ভ্রষ্টাচারীরাজ বাঁচাতে? ▯ দেবব্রত চৌধুরী ▯ ১৭
প্রাচীন ভারতের বিমান ও তার চর্চা ▯ নীতিন রায় ▯ ২২
ইউ পি এ : ভারতের অগ্রগতির পথে এক জগদ্দল পাথর ▯ এম ভি কামাথ ▯ ২৮
অসম আজ কোন দিশায়? ▯ হরিমোহন দাস ▯ ৩০
জাতীয়তাবাদী বিজ্ঞানী ডঃ বীরেশচন্দ্র গুহ ও তাঁর অবদান ▯ ৩২
হিলি সীমান্ত দিয়ে অবাধে চলছে গোমাংস পাচার ▯ ৩৬
বোর্ড তাহলে নির্বাচকদের তুলেই দিক ▯ জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ৩৯
নিয়মিত বিভাগ
চিঠিপত্র: ১৯ ▯ ▯ ভাবনা-চিন্তা : ২০ ▯ ▯ বোধন : ২১ ▯ ▯ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ ▯
অঙ্গনা : ২৬ ▯ ▯ অন্যরকম : ২৭ ▯ ▯ অন্যরকম : ৩৫▯ ▯ ▯ বিশেষ প্রতিবেদন : ৩৭
▯ ▯ সু-স্বাস্থ্য : ৩৮ ▯ ▯ শব্দরূপ : ৪০▯ ▯ চিত্রকথা : ৪১ ▯ ▯ প্রাসঙ্গিকী : ৪২

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

ইউ পি এ বিদায় কোন পথে?
পৃঃ ১৪-১৮

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য
সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য
প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৫ বর্ষ ১৫ সংখ্যা, ১৭ অগ্রহায়ণ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ
যুগাব্দ - ৫১১৪, ৩ ডিসেম্বর - ২০১২

দাম : ৭ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৩২৫ টাকা।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩
অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১
বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.-
Kol.RMS/048/2010-2012

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার বিশেষ বিষয় :

সীমান্ত-প্রণাম

এ এক অনন্যসাধারণ ও অভিনব উদ্যোগ। ফোরাম ফর ইন্টিগ্রেটেড অ্যান্ড ন্যাশনাল সিকিউরিটি (ফিনস্)-এর উদ্যোগে সম্প্রতি এরাজ্যে আয়োজিত হলো 'সীমান্ত প্রণাম' কর্মসূচী। সারা দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রায় ছ'শো ছাত্রছাত্রী উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকাগুলি ঘুরে দেখেন। সীমান্তবাসী নাগরিকদের সঙ্গে সুখ-দুঃখের ভাগীদার হন। অনুপ্রবেশের বিপদ কতটা ভয়াবহ তা উপলব্ধিও করেন তাঁরা। ফিন্সের স্লোগান 'দেশের রক্ষা আমাদের ধর্ম, দেশের সেবা আমাদের কর্ম' — এই স্লোগানের সঙ্গে সীমান্তবর্তী মানুষজনের পরিচয়ও করিয়ে দেন তাঁরা। এসব নিয়েই আমাদের বিশেষ প্রতিবেদন। লিখছেন — সুভাষ নন্দী ও জয়রাম মণ্ডল। সঙ্গে অন্যান্য আকর্ষণীয় বিষয়ও থাকছে।

।। দাম একই থাকছে — সাত টাকা ।।

HB®

INDIA'S NO. 1 IN ISI MARKED HEAVY PIPE FITTINGS

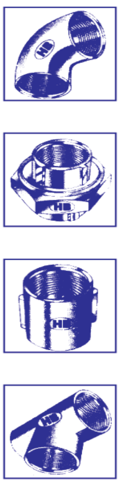

HB® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.

Authorised Distributor

NATIONAL PIPE & SANITARY STORES

54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833
15, College Street, Kol-12
Ph : 2241 7149 / 8174

Sister Concern

Partha Sarathi Ceramics

4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

SUNRISE PURE®

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

মনমোহনী সংস্কার না দুটো ভাত, একটু নুন?

আমাদের দেশে পূর্বেই একপণ্য প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগে ছাড়পত্র দেওয়া হইয়াছিল। তাহার পর চুক্তির মাধ্যমে বিদেশ হইতে ঔষধ, প্রসাধন, পশমতন্তু ইত্যাদিতে আমদানি শুল্ক তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। গত সেপ্টেম্বর মাস হইতে দেশের খুচরো ব্যবসা, বিমা, পেনশন ও রাষ্ট্রায়ত্ত নবরত্ন সংস্থায় বিদেশী বিনিয়োগের ছাড়পত্র দেওয়া হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রীসহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা এফ ডি আই-এর সমর্থনে নানান যুক্তি দিয়াছেন। এফ ডি আই-এর সমর্থনে পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছেন, যাহারা এফ ডি আইয়ের বিরোধিতা করিতেছেন, তাহারা দেশের শত্রু। তাহারা কোন স্বার্থে ফড়েদের পাশে দাঁড়াইতেছেন? প্রশ্ন হইল, অজস্র কুকীর্তিসহ নকল ঔষধ বিক্রিতে যাহাদের জগৎজোড়া পরিচিতি, সেই আমেরিকান ওয়াল মার্ট কোম্পানিরই হাতে দেশের বিয়াল্লিশ হাজার কোটি মার্কিন ডলারের খুচরো ব্যবসার বাজার তুলিয়া দেওয়া হইল কাহার স্বার্থে? দেশের বিভিন্ন সংস্থা থাকিতেও দুটি বিদেশী সংস্থাকে সেট টপ বক্সের জন্য বরাত দেওয়া হইল কোন দেশপ্রেমের তাড়নায়? পেনশন ও বিমায় এফ ডি আই যুক্ত করিয়া ফাট্কাবাজদের লুঠ করিবার সুযোগ করিয়া দেওয়া হইল কাহার সুবিধার্থে? এই মারাত্মক সংস্কারের ফলে আম -জনতার ইতিমধ্যেই নাভিশ্বাস উঠিয়াছে। অথচ সংস্কারকে অর্থবহ করিতে হইলে মন্ত্রী ও সাংসদদের সব সুযোগ-সুবিধার ইতি ঘটানো হইল না কাহার স্বার্থে? আসলে আর্থিক সংস্কারের উদ্দেশ্যই হইল আম-আদমির জন্য মেকি নিবেদিতপ্রাণ শাসক দলের সদস্যদের দেশের সম্পদ ও বিত্তের লুণ্ঠনকে ত্বরান্বিত ও ব্যাপকতর করা। সেই জন্যই বিদেশে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত বিপুল পরিমাণ টাকা উদ্ধার করিয়া দেশে লগ্নি করিবার প্রয়াস আর্থিক সংস্কারের মধ্যে পড়িল না। টু-জি স্পেকট্রাম, কমনওয়েলথ গেমস্, কয়লা কেলেঙ্কারির মতো পুকুর চুরির ঘটনার বিপুল পরিমাণ টাকা উদ্ধারে সরকার নীরব রহিল সেই জন্যই। 'গাছে তো আর টাকা ফলে না'— বলিয়াও কেবল সরকার বাঁচাইতে প্রধানমন্ত্রীর এক রাতের 'নৈশ ভোজ'-এর জন্য ২৯ লক্ষ টাকা খরচ করা হইল কোন যুক্তিতে? সরকার বলিতেছে, এফ ডি আই-এর ফলে চাষিরা ভালো দাম পাইবে ফসলের, কিন্তু ইহার নিশ্চয়তা দিতে সরকার প্রস্তুত কি? দেশীয় খুচরো ব্যবসা, শিল্প ও কোম্পানি বাঁচাইতে সরকারি কোনও পদক্ষেপ নাই। অথচ প্রয়োজন ছিল ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নে।

আজ এফ ডি আই লইয়া বহুমুখী জ্ঞান বিতরণ চলিতেছে। কেন্দ্রের চোখে সংস্কার মানেই গরীব মানুষের পকেটে হাত ঢুকাইয়া ঘাটতি পূরণ। পেট্রোল, ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধি, রান্নার গ্যাসে ভর্তুকি ছাঁটাই, সারের সঙ্কট, করের চাপ, বেসরকারীকরণ ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু একটি সংখ্যালঘু সরকারের এই অনৈতিক কাজকর্মের যথার্থ প্রতিবাদ হইতেছে কি? কেহ ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থে অনাস্থা প্রস্তাব আনিতেছে আবার কেহ ১৮৪ ধারা বা ১৯৩ ধারা লইয়া মাতামাতি করিতেছে। কেহ নির্বাচনকে ভয় পাইতেছেন, আবার কেউ কেন্দ্রের ত্রাতার ভূমিকায়। কেহ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নির্লজ্জ দালালি করিয়া দেশের সার্বভৌমত্বকে জলাঞ্জলি দিতেছেন, আবার কেহ দেশকে পরমবৈভবশালী রাষ্ট্র বানাইবার স্বপ্ন দেখিতেছেন। সরকার বলিতেছেন, এফ ডি আই-এর মাধ্যমে তিন বছরে ১০ লক্ষ কর্ম সংস্থান হইবে, কিন্তু ১২০ কোটির দেশে মাত্র ১০ লক্ষ কর্মসংস্থান! যদিও অন্যরা বলিতেছেন, এফ ডি আই হইলে বছরে ৫ লক্ষ লোক কর্ম হারাইবে।

সময়ের তালে গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি ঘটিবে, দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি ঘটিবে এটা সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু সব কিছুরই একটা লক্ষ্মণরেখা থাকা উচিত। দেশের গরীব মানুষকে বাদ দিয়া উন্নয়ন সম্ভব নয়। আর্থিক সংস্কার তাই গরীব মানুষের স্বার্থের পরিপন্থী না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু আম-আদমির স্বার্থের নাম করিয়া যাহা হইতেছে তাহার নাম লুণ্ঠন। তবে সাধারণ মানুষ কাহাকেও অবাধ অধিকার দেয় নাই, কিছু সময়ের জন্য কাহারও শাসনের অধিকার মঞ্জুর করে মাত্র। আজ যাহারা এই কেন্দ্রীয় সরকারের সমর্থক, কেন্দ্রের এই জনবিরোধী পদক্ষেপের সমান দায়িত্ব তাহাদেরও। আগামী নির্বাচনে মানুষ তাহাদের ভূমিকাও পর্যালোচনা করিবে।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

"পুরাণ-লেখকেরা সকলেই— তাঁরা যা যা দেখেছিলেন বা শুনেছিলেন, সেইগুলি রূপকভাবে লিখে গেছেন। তাঁরা কতকগুলি প্রবাহাকার চিত্র এঁকে গেছেন। তাঁর ভিতর থেকে কেবল তার প্রতিপাদ্য বিষয়টা বার করবার চেষ্টা করে ছবিগুলিকে নষ্ট করে ফেলো না। সেগুলিকে যথাযথ গ্রহণ কর, সেগুলি তোমার উপর কাজ করুক। এদের ফলাফল দেখে বিচার কর— তাদের মধ্যে যেটুকু ভাল আছে, সেটুকুই নাও।" — স্বামী বিবেকানন্দ

৫০ বছর পরেও তাওয়াং-এ সম্পূর্ণ হলো না রাস্তা তৈরি

বিরাজ রায়॥ চীন-ভারত যুদ্ধের পঞ্চাশ বছর পূর্তি হলো। এত বছর পরেও বেহাল অবস্থা পূর্ব অরুণাচল প্রদেশের তাওয়াং থেকে তেজপুর পর্যন্ত হাইওয়ের। পূর্ব ভারতের চীনা সীমান্তে আন্তর্জাতিক সীমা বরাবর এই রাস্তাটি সেনাদের ব্যবহারের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। '৬২-র যুদ্ধে তাওয়াংয়ে যান চলাচলযোগ্য কোনও রাস্তা না থাকায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল ভারতীয় সেনাবাহিনী। দুর্গম পাহাড়ে তৈরি করে নিতে হয়েছিল পায়ে হাঁটা পথ। সেই অবস্থা থেকে এখনও বেরিয়ে আসতে পারেনি তাওয়াং। সরকারের চরম উদাসীনতায় আজও মৃত্যুকূপ হয়ে আছে সেই রাস্তা।

এক সময় তাওয়াং থেকে তেজপুর পর্যন্ত ৩২৯ কিমি রাস্তাটির মধ্যে ২৫০ কিমি সম্প্রসারণ করে 'ডবল লেন' করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। ২০১২ সালের মধ্যে সেই কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার কথা। কিন্তু সময়সীমা শেষ হতে চললেও রাস্তা তৈরির কাজ শেষ করে উঠতে পারেনি 'বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন'। রাস্তাটি যে কেবলমাত্র সেনাবাহিনীর জন্যই গুরুত্বপূর্ণ তা নয়। তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে অরুণাচলের চারটি জেলার মানুষের জীবন-জীবিকা। যেমন 'হিমালয়ান হোলিডে'-তে প্রচুর পর্যটকের সমাগম হয়। কিন্তু রাস্তার এই বেহাল অবস্থার জন্যও মার খাচ্ছে এই পর্যটন ব্যবসা। টান পড়ছে রুজি-রোজগারে। পাঁচ বছর আগে তেজপুর থেকে তাওয়াং যেতে সময় লাগত ১৬ ঘণ্টা। এখন লাগছে ৪৮ ঘণ্টা। ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে এই রাস্তায় যাতায়াতকারীদের। তাই এটাও একটা মাথাব্যাথার কারণ হয়েছে। অরুণাচলের মোটর ট্রান্সপোর্ট ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট একরাশ ক্ষোভ নিয়ে বলেন— 'এটাই সম্ভবত ভারতের সবচেয়ে খারাপ হাইওয়ে। প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও রাস্তা তৈরির কাজ এত ধীর গতিতে হচ্ছে কেন বুঝতে পারছি না।"

ধীর গতিতে চলছে রাস্তার কাজ।

রাস্তা নির্মাণের প্রকল্পটি বরাদ্দ নেওয়া সংস্থা 'বর্তক'-এর চীফ ইঞ্জিনিয়ার রোহিত কাপুর জানিয়েছেন, পাহাড়ি অঞ্চলে বিভিন্ন সমস্যা থাকার জন্য কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না। পর্যাপ্ত সংখ্যায় শ্রমিকের অভাব রয়েছে। আগে ঝাড়খন্ড, ওড়িশা থেকে শ্রমিক আনা হোত, এখন তা কমে গেছে। প্রয়োজন মতো পাথরও পাওয়া যাচ্ছে না। বছরে যেখানে ছয় লাখ কিউবিক মিটার পাথর দরকার সেখানে পাওয়া যাচ্ছে দুই লাখ। পাথর ভাঙার যন্ত্রপাতি না থাকায় হাতেই করতে হচ্ছে, তাই সময় বেশি লাগছে।' কাজ করতে গিয়ে এত সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে কেন? —এই প্রশ্নের কোনও সদুত্তর মেলেনি বি আর ও-র কাছ থেকে। অরুণাচলের মুখ্যমন্ত্রী নাকম টুকি সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছেন এবং বিকল্প কোনও উপায় বার করতে বলেছেন যাতে তাড়াতাড়ি তাওয়াং থেকে গুয়াহাটি হয়ে ভুটান পর্যন্ত রাস্তাটি সম্প্রসারণ করা যায়। এজন্য চাপও দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন। কাজের ক্ষেত্রে এখানে প্রাকৃতিক বাধা রয়েছে। অধিকাংশ সময় বৃষ্টি ও 'তুষারপাত' হওয়ায় কাজ করতে অসুবিধা হয়। এছাড়াও পাহাড়ি ধসের মতো বিপর্যয় রয়েছে। কিন্তু প্রতিরক্ষার কথা ভেবে পঞ্চাশ বছরেও তা কি করা সম্ভব হলো না? সেটা কি সদিচ্ছার অভাবের কারণে? সেই উত্তর এখনও অজানা। তাই সংশয় থেকেই যাচ্ছে রাস্তাটি আদৌ তৈরি হবে কি না!

'৬২-র যুদ্ধে ভারত চীনের কাছে শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়েছিল। কারণ যুদ্ধ করার মতো সামরিক শক্তি ভারতের ছিল না। দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলও যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব ভারতীয় সেনাবাহিনীকে আরও দুর্বল করে দিয়েছিল। কিন্তু তাতেও ভারতের টনক নড়েনি। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় বরফের উপর দিয়ে গোলাবারুদ সরবরাহ সম্ভব হচ্ছিল না বা অজ্ঞাত অন্য কোনও কারণে চীন হঠাৎ যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে তারা ভারত সীমান্তে যুদ্ধের পরিবেশ তৈরি করতে উঠে-পড়ে লেগেছে। রাস্তা নির্মাণ থেকে শুরু করে বিমান ঘাঁটি নির্মাণ সব কাজেই চীন এগিয়েছে। সেই তুলনায় ভারত যে কিছুই করে উঠতে পারেনি, এই রাস্তাই তা দেখিয়ে দিয়েছে। বর্তমানে বিশ্বে ভারতের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী চীন। আর চীনা বাহিনী যেভাবে ভারতের প্রতি আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছে, তাতে যে কোনও সময় যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হতেই পারে। কিছুদিন আগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুশীল কুমার সিন্ধে জানিয়েছেন— 'চীনের সঙ্গে কোনও যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হয়নি।' তাই বলে প্রতিরক্ষার জন্য সীমান্তবর্তী অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা সুদৃঢ় করা হবে না?

তোষণ নীতির জেরে কেন্দ্রের চিকিৎসা পদ্ধতিতে আয়ুর্বেদ অচল

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গুজরাটসহ বেশ কয়েকটি রাজ্যে নির্বাচনের মুখে ২৬।১১-র অপরাধী আজমল কাসভকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে জাতীয়তাবাদী ভাবমূর্তি তৈরিতে কংগ্রেস সচেষ্ট হলেও মুম্বই হামলার প্রেক্ষিতে সরকারের সংখ্যালঘু তোষণ নীতির যে বিশেষ হেরফের হচ্ছে না, সাম্প্রতিক বিভিন্ন ঘটনায় তার প্রমাণ মিলছে। এমনই একটা ঘটনা হলো সরকারের উদাসীনতায় ভারতীয় সেনা এককথায় নাকচ করে দিয়েছিল ২৬।১১-র ঘটনায় গুরুতর আহত প্রাক্তন এন এস জি কম্যান্ডো নায়েক পি ভি মানেশ-এর আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার খরচের বিল। তবে সেনার বকলমে সরকারের এহেন অমানবিক মুখের পাশাপাশি দেশের নাগরিকদের আশ্বস্ত করবে কেরলের একটি বেসরকারি আয়ুর্বেদ হাসপাতালের মানবিক আচরণ। যে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ নিখরচায় মানেশের চিকিৎসার বিপুল ভার বহন করতে রাজি হয়েছেন স্বেচ্ছায়। ২০০৮-এর ২৮ নভেম্বর সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে লড়াইয়ে গ্রেনেড ফেটে গুরুতর জখম হন মানেশ। এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসায় তিনি সাড়া তো দেন-ই না। উপরন্তু তাঁর পা দু'টি অবশ হলে আংশিক পক্ষাঘাতের কবলে পড়ে যান। এই অবস্থায় আয়ুর্বেদ চিকিৎসা শুরু হলে ভালই সাড়া দিচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু ব্যয়বহুল এই চিকিৎসার ভার একার পক্ষে বহন করা সম্ভব ছিল না মানেশের। কিন্তু সেনাবাহিনীর সৌরচক্র পুরস্কার জয়ী নায়েক পি ভি মানেশের চিকিৎসার খরচ দিতে কেন অস্বীকার করল সেনা তা নিয়ে ইতিমধ্যেই বিতর্কের ঝড় উঠেছে। দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কর্মরত শ্রীমানেশ তাঁর আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার জন্য কোটাক্কালের আর্য বৈদ্যশালা-তে নিজের গাঁটের কড়ি খরচা করেন। পরে এর বিল সেনা-কর্তৃপক্ষকে দিতে গেলে তাঁরা জানান, আয়ুর্বেদ চিকিৎসা নাকি চিকিৎসাশাস্ত্রে গ্রাহ্য নয়। তাই ওই বিল পেমেন্ট করতে সেনাবাহিনী অপারগ। আর এখানেই প্রলম্বিত হচ্ছে কেন্দ্র সরকারের ছায়া। কারণ মানেশ নিজমুখেই বলছেন, 'আমাকে স্পেশাল কেস হিসেবে বরাবরই বিবেচনা করা হয়েছে। আমাকে আপ্ত-সহায়কও দেওয়া হয়েছিল। এবং স্থানীয় ব্যাটেলিয়ান থেকে সবরকম সাহায্য করা হোত।' এই পরিস্থিতিতে মানেশের চিকিৎসা-খরচ মেটাতে সেনাবাহিনীর উদাসীন মনোভাবের কোনও কারণ ছিল না বলেই তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অভিমত। তাঁরা বরং এর পেছনে কেন্দ্রের সংখ্যালঘু তোষণ নীতিরই ছায়া দেখছেন। যে নীতির বলে ইউনানি চিকিৎসা কেন্দ্রীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে গ্রাহ্য হলেও, দেশের সংস্কৃতি ও পরম্পরার ধারক-বাহক সুপ্রাচীন আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার কোনও স্থান নেই। অথচ এই আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার বলেই অর্ধপক্ষাঘাতগ্রস্ত মানেশ আশা করছেন অদূর ভবিষ্যতে তিনি সুস্থ-সবল হয়ে হাঁটতে পারবেন।

'ফিসচুলা, পাইলস্ থেকে বিনা রক্তপাতে চিরমুক্তি'

পায়ুদ্বারের ভেতরে বা বাইরের নানা শিরা উপশিরায় জ্বালাময়, যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতিই হলো পাইলস্।

পায়ুদ্বারের পাশে হওয়া গর্ত থেকে পুঁজ, গ্যাস, রক্ত বা বায়ু ইত্যাদি নির্গত হলে তা হলো ফিসচুলা। এই সমস্ত রোগে রোগীরা এর ওর কথায় টোটকা ব্যবহার করেন। তাতে যন্ত্রণা বেড়েই চলে। ডাক্তারের কাছে গেলে উপদেশ দেন অপারেশনের। পুনঃ পুনঃ অপারেশনেও সারে না। কখনও কখনও সৃষ্টি হয় নতুন সমস্যা, অথচ আমাদের আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতি বিনা অপারেশনে যন্ত্রণাহীন চিকিৎসার পথ খুঁজে পেয়েছে অনেককাল আগেই। আয়ুর্বেদে ক্ষারসূত্র ও কেমিক্যাল কর্টারির সুনিপুন মিশ্রণে **জীবক আয়ুর্বেদিক স্পেশালিটি সেন্টার** তৈরি করেছে এক অভিনব চিকিৎসা পদ্ধতি। যার সফলতম প্রয়োগে পাইলস এবং ফিসচুলার যন্ত্রণাহীন কার্যকরী চিকিৎসা করা সম্ভব। এই জাতীয় চিকিৎসায় নামমাত্র কাটা ছেঁড়ার প্রয়োজন হয়। তাই রোগী চিকিৎসার পর পায়ে হেঁটে বাড়ী ফিরতে পারেন।

না এটা কোন হাতুড়ে অস্ত্রোপচার নয়, বিগত দশ বছর ধরে যে পদ্ধতিতে এখানে শত শত রোগী চিরতরে সুস্থ হয়েছেন সেই পদ্ধতি জাপানে তোয়ামা মেডিক্যাল কলেজ এবং নেপালে ত্রিভুবন ইউনিভার্সিটির চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের দ্বারা পরীক্ষিত এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দ্বারা (WHO) স্বীকৃত দিল্লীর AIIMS ও চণ্ডীগড়ের P.G.I. তেও এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে।

কি কি চিকিৎসা হয় এই পদ্ধতিতে?

প্রোলাপ্স পাইলস্, ফিসচুলা, ব্লিডিং পাইলস, পাইলোনিডাল সাইনাস, রেক্টোভ্যাজাইনাল ফিসচুলা, ফিসার সবকিছুরই চিরতরে মুক্তি ঘটে।

জীবক আয়ুর্বেদিক স্পেশালিটি সেন্টার

হাকিমপাড়া, হরেন মুখার্জী রোড, G.T.S. ক্লাবের নিকটে জর্জ ইনস্টিটিউট বিল্ডিং, শিলিগুড়ি

ডাঃ এস জে কর, **মোবাইল নং-9434877734**

—ঃ এখানে রোগীদের দেখার সময় ঃ—

সোমবার থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২.৩০টা পর্যন্ত এবং বিকেল ৫ টা থেকে ৮টা পর্যন্ত।

ও শনিবার ঃ বিকেল ৫ টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত।

বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের দাপটে অসমে অস্তিত্বের সংকটে সবকটি জনগোষ্ঠী

ক্রমশই এক অনিবার্য ট্র্যাজেডির দিকে এগিয়ে চলেছে আমাদের প্রতিবেশী রাজ্য অসম। উত্তর-পূর্বের এই প্রধান রাজ্যের প্রতিটি জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বই এখন গভীর সঙ্কটে। এর কারণ, বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশ। সম্প্রতি দিল্লীর 'ইনস্টিটিউট ফর কনফ্লিক্ট

ম্যানেজমেন্ট' আয়োজিত 'দ্য-মাল্টিপল ক্রাইসিস অব দ্য নর্থ-ইস্ট' শীর্ষক এক আলোচনাচক্রে এমন স্পষ্ট কথা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, পাঞ্জাব পুলিশের বিতর্কিত প্রাক্তন ডিরেক্টর জেনারেল কে পি এস গিল। এই আই পি এস অফিসার দীর্ঘদিন অসম-সহ উত্তর-পূর্বের বেশ কয়েকটি রাজ্যে দীর্ঘকাল কাজ করেছেন। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি আশঙ্কা করছেন যে সেইদিনটি আর বেশি দূরে নেই যখন অসমে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্রের দাবিতে হিংসাত্মক আন্দোলন শুরু হয়ে যাবে। উত্তর-পূর্বের বিচ্ছিন্নতাবাদী গুপ্ত সংগঠনগুলির মদতে অসমে জঙ্গি আন্দোলন এখন শুধুই সময়ের অপেক্ষা। পাকিস্তানের মদতে যেমন জম্মু ও কাশ্মীরে অশান্তির আগুন জ্বলছেই। শত চেষ্টাতেও ভারতীয় সেনাবাহিনী বিচ্ছিন্নতাবাদী আক্রমণ দমন করতে পারছে না। তেমনি প্রতিবেশী তিন রাষ্ট্র বাংলাদেশ, চীন ও মায়ানমারের মদতে অনুপ্রবেশকারীরা অসমে সশস্ত্র হিংসাত্মক দীর্ঘস্থায়ী লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

সাম্প্রতিক ভয়াবহ বড়োল্যান্ড দাঙ্গার পর বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশকারী ইস্যুটি সারা দেশের কাছেই উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। দিল্লীতে জাতীয় স্তরের এই সেমিনারে বক্তাদের বক্তব্যে সেটা স্পষ্ট। দু' একটি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত ছাড়া সব বক্তাই একমত যে মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যাধিক্যের চাপে ভূমিপুত্রদের অস্তিত্ব অসমে এখন বিপন্ন। তাই বাংলাদেশীদের দ্রুত ফেরত পাঠানো সম্ভব না হলেও অন্তত অনুপ্রবেশকারীদের রাজনৈতিক অধিকার বা ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হোক। কারণ, এরা বাংলাদেশের নাগরিক। বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনের সময় এই অনুপ্রবেশকারীরা অসম সীমান্ত লাগোয়া বাংলাদেশের গ্রামে দলে দলে ঢুকে ভোট দেয়। একই সঙ্গে বাংলাদেশ ও ভারতের দ্বৈত নাগরিকত্বের সুবিধা ভোগ করা যায় না। এই অনুপ্রবেশকারীরা গাছের এবং মাটিতে পড়া দুই রকম পাকা ফলই খায়। এদের খাদ্য হতে সারা দেশ থেকে লক্ষ লক্ষ গোরু পাচার হচ্ছে। সীমান্ত এলাকায় অপরাধীদের স্বর্গরাজ্য গড়ে উঠছে। অনুপ্রবেশকারীদের জন্যই উত্তর-পূর্বের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব এখন সঙ্কটের মুখে পড়েছে। একমাত্র স্বস্তিদায়ক অবস্থানে রয়েছে মুসলিম অনুপ্রবেশকারীরাই।

তবে জনবিন্যাসের এই উলটপুরাণের জন্য দায়ী অসমের ভূমিপুত্ররাই। তারা ভালো দাম পেয়ে তাদের পূর্বপুরুষের জমিজমা বাংলাদেশীদের কাছে বিক্রি করেছে। এখন তাঁরা বুঝেছেন যে নিজের ঘরে নিজেরাই আশ্রয়হীন। অসমের বড়োল্যান্ডে এই ঘটনাই ঘটেছে। বাংলাদেশীদের কাছে বেচে দেওয়া জমির মালিকানা ফেরত পেতে চাইলে

গূঢ়পুরুষের

কলম

ভূমিপুত্রদের সঙ্গে অনুপ্রবেশকারী মুসলিমদের দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়। এই দাঙ্গার আগুন পুরোপুরি নেভাতে ব্যর্থ রাজ্য প্রশাসন। অসমে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের স্রোত চলবেই। কারণ, উত্তর-পূর্বে শ্রমজীবী মানুষের ব্যাপক অভাব রয়েছে। জমিতে ফসল বোনা ও ফসল কাটা সহ দিন মজুরি, রিক্সা চালানো ইত্যাদি দৈহিক শ্রমসাধ্য কাজ করার ব্যাপারে অসমসহ সমগ্র উত্তর-পূর্বের ভূমিপুত্রদের প্রবল অনীহা আছে। শ্রমিকের চাহিদা মেটায় অনুপ্রবেশকারীরা। অবিভক্ত বৃটিশ রাজত্বের সময় অসমে শ্রমিক চাহিদা মেটাতে বিহার ও বর্তমান ঝাড়খন্ড থেকে লোক এসেছিল। এখন বিহার-ঝাড়খন্ড থেকে খুবই কম মজুর অসমে যায়। শ্রমিক চাহিদার এই শূন্যস্থান পূরণ করছে বাংলাদেশীরা। বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে বিতাড়ন কঠিনতম কাজ। অসমে প্রায় ৪৯ শতাংশ মুসলিম অসমিয়া ভাষায় কথা বলে। অনুপ্রবেশকারীরা এই অসমিয়াভাষী মুসলিমদের সঙ্গে এমনভাবে মিশে গেছে যে এদের আলাদাভাবে চিহ্নিত করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। তবুও এই দুরূহ কাজটি করতেই হবে। তাদের সনাক্ত করে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুবিধাগুলি খারিজ করতে হবে। এইটুকু করতে পারলেই অসমসহ উত্তর-পূর্বকে বিচ্ছিন্নতাবাদ থেকে রক্ষা করা যাবে।

কাশ্মীরে আমরা সময়মতো পদক্ষেপে ব্যর্থ হয়েছি। তার বিষময় ফল আজ দেশবাসীকে ভুগতে হচ্ছে। অসমেও আমরা সেই একই ভুল করছি।

লজ্জা নারীর ভূষন, নির্লজ্জতা কংগ্রেসের

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,
৭, রেস কোর্স রোড, নয়াদিল্লী

স্যার, চিঠিটা আপনাকে না লিখে ম্যাডাম গান্ধীকেই লেখা উচিত। কিন্তু গোটা দেশের রাজনৈতিক বিরোধিতার মধ্যে যেভাবে কুশলী হাতে নিজের দলকে রক্ষা করতে তিনি ব্যস্ত তাতে আর বাড়তি চিঠি পড়ার ভার চাপালাম না। আপনি দয়া করে এই বার্তাটুকু তাঁকে দিয়ে দেবেন প্লিজ।

আচ্ছা আর্থিক কেলেঙ্কারি ঢাকতে আপনারা যে চেষ্টা করে যাচ্ছেন তাকে কি নির্লজ্জতা বলা যায় না! টুজি স্পেকট্রাম কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে মন্ত্রী, আমলা এবং আপনাদের ঘনিষ্ঠ কর্পোরেট কর্তাদের ইতিমধ্যেই জেল খাটতে হয়েছে। তথ্য প্রমাণ সহ সিবিআই চার্জশিট দেওয়ার পরও আপনারা দাবি করেছেন, স্পেকট্রাম বিলি নিয়ে সিএজি সঠিক রিপোর্ট দেয়নি। বিপুল আর্থিক দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে সিএজিকে নস্যাৎ করা ছাড়া উপায়ই বা কী ছিল? শুধু টুজি নয়, কয়লা কেলেঙ্কারির ক্ষেত্রেও প্রথম থেকেই আপনারা সিএজি রিপোর্টকে মানতে চাননি। আর্থিক দুর্নীতির পরিমাণকে খাটো করে দেখানোই ছিল আপনাদের লক্ষ্য।

একটা প্রতিষ্ঠানকে খাটো করে দেখিয়ে একজন আধিকারিকের ব্যক্তিগত বক্তব্যকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। এটা ঠিক জলে ডুবতে থাকা মানুষের খড়কুটো ধরে বাঁচার চেষ্টার সামিল। সিএজি-র প্রাক্তন ডিরেক্টর জেনারেল বলেছেন, টেলিকম মন্ত্রকের হিসাব পরীক্ষায় আমার প্রত্যক্ষ দায়িত্ব ছিল। আর তাতে কোনও লোকসানের হিসাব ছিল না। আচ্ছা, এই দাবির কী গ্রহণযোগ্যতা আছে? কী প্রমাণ আছে? তবু সেটাকেই চূড়ান্ত ধরে নিলেন কংগ্রেস নেতারা।

এরপর চাল নম্বর টু। প্রধানমন্ত্রী স্যার, আপনার দল কংগ্রেস এরপর বিজেপি

নেতা মুরলী মনোহর যোশিকে এর মধ্যে টেনে এনে দাবি তুলেছে, যোশি নাকি তাঁর বাড়িতে সিএজি কর্তাদের ডেকে এনে বাড়িতে বসে পিএসি রিপোর্ট তৈরি করিয়েছেন। প্রথমে সিএজি মানে কম্পট্রোলার অ্যান্ড জেনারেল এবং পরে পিএসি মানে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি দুটি সংস্থার নামেই নিরপেক্ষতার প্রশ্ন তোলা হলো। দুটি সংস্থাই কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন দুটি সরকারি হিসাব পরীক্ষক সংস্থা। এ কৌশল তো নিজের সরকারে থাকে দেশের সরকারি ব্যবস্থাকেই চ্যালেঞ্জ করা।

যে কারণে এই দুই সংস্থাকে হেয় প্রমাণ করতে আপনারা ব্যস্ত তারা ঠিক কী বলেছে? বলেছে, ২০০৮ সালে যখন টুজি স্পেকট্রাম বিলি হচ্ছে তখন তার দাম ধরা হয়েছে ২০০১ সালের হিসেবে। ভাবা যায়, সাত বছরে দুনিয়ায় সবের দাম বেড়েছে, শুধু টুজি ছাড়া। যাইহোক, স্পেকট্রাম পাওয়া যে-কোনও বেসরকারি সংস্থার কাছেই অত্যন্ত লাভজনক। এনিয়ে প্রতিযোগিতা থাকাটাও স্বাভাবিক। তাই সরকার যদি নিলামের পথে যেত তবেও অনেক রাজস্ব আদায় হোত দেশের। কিন্তু সে পথে না হেঁটে, স্পেকট্রাম সংস্থাগুলির স্বার্থ দেখে নিয়ম ভাঙে সরকার নিজেই। গোটা বেআইনি প্রক্রিয়া মেটানোর জন্য মন্ত্রী, আমলা এবং কর্পোরেট সংস্থার কর্তাদের গোপন আঁতাত কাজ করেছে। দ্রুততার সঙ্গে সেরে ফেলা হয়েছে গোটা ঘটনা। প্রচুর পরিমাণে ঘুষ দেওয়া নেওয়াও যে হয়েছে তেমন অনেক প্রমাণও মিলেছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম এবং বর্তমান রাষ্ট্রপতি তথা প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ের পরস্পরবিরোধী বক্তব্যও দুর্নীতি প্রমাণ করেছে। কিন্তু, কিন্তু, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী স্যার আপনি এসব নিয়ে কোনও তদন্ত চাননি। বলুন, এটাকে কেউ নির্লজ্জতা বললে আপনি সত্যিই রাগ করবেন কি?

অন্যদিকে একজন আধিকারিকের বিবৃতির ওপর নির্ভর করে দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোয় দুটি স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের মানহানি করছেন আপনারা। এটা কি একরকমের কাঁচের ঘরে বসে ঢিল ছোঁড়া নয়!

— সুন্দর মৌলিক

মমতার কর্মকাণ্ডে সুবিধা হচ্ছে কংগ্রেস-সিপিএমেরই

নিশাকর সোম

আজ রাজ্য-রাজনীতিতে দিল্লীর ঢেউ এসে পড়েছে। যেহেতু সেই ঢেউ-এর উদ্‌গাতা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি কেন্দ্রীয় শাসনকে বিপর্যস্ত করার চিন্তাতেই বিভোর, তাই রাজ্যের ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে লোকসভায় অনাস্থা প্রস্তাব আনার ক্ষেত্রে তিনি ভালোভাবেই জানতেন যে তাঁর হুকুমে সিপিএম-বিজেপি পার্টি তাঁকে সমর্থন করবে না। পঞ্চাশজনের সমর্থন না থাকলে যে অনাস্থা প্রস্তাব আনা যায় না এ সত্যটা কি তাঁর জানা ছিল না? এই অনাস্থা প্রস্তাব বাতিল হওয়ার ফলে কি দাঁড়ালো? (১) ইউপিএ-২ সরকার পরোক্ষে আস্থা পেল। (২) মমতা যদিও বলে চলেছেন--- 'কেন্দ্রীয় সরকারকে কারা বাঁচাতে চায় তা পরিষ্কার হয়ে গেল'। তবে বাস্তব হলো মমতাই কেন্দ্রীয় সরকারকে বাঁচালেন।

এই বাঁচানোর কারণ--- (১) রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলার অবস্থা ভালো নয়, (২) জনসাধারণের মধ্যে দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি, বাসভাড়া নিয়ে ঘটনার ঘনঘটা, বাস-ট্যাক্সি-এর মালিকদের গর্জন অব্যাহত, পরিবহণের জন্য সরকারের অবিমৃষ্যকারী পদক্ষেপে পরিবহণের সকল ট্রেড- ইউনিয়নের ঐক্যবদ্ধ হওয়া, (৩) সিঙ্গুর-এর জমি নিয়ে সমস্যা মেটাতে না-পারার জন্য 'দিদি' আর সিঙ্গুরমুখী হন না, (৪) নন্দীগ্রামে তৃণমূলের দ্বন্দ্ব। এইরকম নানা সমস্যা থেকে জনগণের মন ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য অনাস্থা প্রস্তাব আনার রাজনৈতিক চাল চেলেছিলেন তিনি। সত্যই তিনি অনাস্থা নিয়ে যদি গুরুত্ব দিয়ে থাকতেন তাহলে তাঁর উচিত হোত— বিজেপির সঙ্গে প্রথমেই আলোচনায় যাওয়া। কারণটা খুবই স্পষ্ট যে, বিজেপিই লোকসভায় প্রধান বিরোধী দল। মমতা মনে করেছিলেন তিনি 'ডিকটেট' করলে এঁরা সবাই সুড়সুড় করে তাঁকে অনুসরণ করবেন। অন্য দলের নিজের কোনও স্বাতন্ত্র্য থাকবে না? আসলে যে কথা বারবার এই কলামে লেখা হচ্ছে--- তা হলো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একনায়কবাদী, স্বাতন্ত্র্য এবং কারুর পরামর্শের ধার ধারেন না। তাঁর মনে রয়েছে সর্বভারতীয় নেত্রী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা। এর ফলে তাঁর দলে 'থেকেও নেই' কবীর সুমন অনাস্থা প্রস্তাবের সমর্থনে দাঁড়াননি। এমনকী তৃণমূলের নির্বাচনী শরিক এস ইউ সি সদস্যও মমতাকে সমর্থন দেননি। বস্তুত যখন এফ ডি আই-এর পূর্বের আলোচনার সময়ে তৃণমূল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় এবং ইউপিএ-তে ছিল। আসলে সকল অস্বস্তিকর পরিস্থিতিকে ঘুরিয়ে দেবার জন্য এই অনাস্থা প্রস্তাবের এক হাস্যকর প্রচেষ্টা। মমতা

রাজ্য রাজনীতি

যেমন ফোন করে নিজের মন্ত্রী-নেতাদের নির্দেশ দেন তেমনি সুষমা স্বরাজকেও ফোন করেছিলেন।

তেহট্টে বিরোধীদের যেতে না-দেওয়া, ত্রি-ফলা নিয়ে কংগ্রেসের সমাবেশে লাঠিচার্জ, প্রতিটি ঘটনায় বিরোধী বাধা দেওয়ার যে নীতি বামফ্রন্ট নিয়েছিল সেই পথেই তৃণমূল সরকার হাঁটছে। তৃণমূলের মন্ত্রিসভায়, জেলাস্তরে, ট্রেড ইউনিয়নে, যুব-সংগঠনে, ছাত্রসংগঠনে একাধিক গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে লিপ্ত।

মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মন্ত্রিসভা থেকে বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে রাজনৈতিক সন্ন্যাস নিতে চাইছেন। সিঙ্গুরের এই পরিচ্ছন্ন বিধায়ককে প্রথমে শিক্ষামন্ত্রী করে সরিয়ে এনে কৃষিমন্ত্রী করা হলো। এখন আবার তাঁকে কৃষি থেকে সরিয়ে অন্য একটি দফতরে আনা হলো। কোনও আলোচনা নেই। শুধু মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে মন্ত্রী শ্যামল মণ্ডল বাদ পড়লেন। এমনকি কলকাতাকে লন্ডন বানাতে লন্ডনে যাবার জন্য শিল্পমন্ত্রী পার্থ চ্যাটার্জি এবং নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ (ববি) হাকিমের নাম স্থির হয়। হঠাৎ পার্থ চ্যাটার্জি বাদ গেলেন ববি হাকিম লন্ডন গেলেন এবং সেখানে তিনি নাকি শিল্পপতিদের সভায় বক্তৃতাও করবেন। নির্দেশ এলো কংগ্রেসকে ভেঙে দেবার জন্য। কংগ্রেস ত্যাগী দু'জন বিধায়ক যথা— কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী এবং হুমায়ুন কবীরকে মন্ত্রী করলেন। এর মধ্যে কৃষ্ণেন্দুকে পূর্ণ মন্ত্রীর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। তাহলে এটাই বোঝা যাচ্ছে অন্যদল থেকে লোক ভাঙানোর জন্য তিনি পরোক্ষে পুরস্কার ঘোষণা করলেন। এর ফলে তৃণমূলের বহু বিধায়ক ক্ষুব্ধ হলেন— বিক্ষুব্ধদের তালিকায় রয়েছেন অশোক দেব, তাপস রায়, সুজিত বসু প্রমুখ।

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের এক নির্মম ঘটনা হলো বালির তৃণমূল কর্মী তপন দত্তকে হত্যা করা। তাতে নাকি মন্ত্রী অরূপ রায়কে প্রথম চার্জশিটে নাম দিয়ে সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটে তাঁর নাম বাদ দেওয়া হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। তপন দত্তের বাড়িতে বাম বিধায়করা গেলে তৃণমূলকর্মীরা বিক্ষোভ দেখালেন। বিরোধীনেতা সূর্যকান্ত মিশ্র যেখানেই যাচ্ছেন সেখানে বিক্ষোভ দেখানো হচ্ছে। শুধু তাই নয়, যেসব গ্রামে সিপিএমের বাহিনী মাথা তুলতে চাইছে— সেখানেই তৃণমূলের আক্রমণ চলছে। এটা বোঝা যাচ্ছে পঞ্চায়েত নির্বাচন যত কাছে আসবে রাজ্যে হানাহানির ঘটনা বাড়তে থাকবেই। তেহট্টে রবীন দেবের নেতৃত্বে বামনেতাদের পুলিশ যেতে দিল না। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অধীর চৌধুরী এবং দীপা দাসমুন্সিকে বাধা দেওয়া হলো। যদিও অধীর চৌধুরী কৌশলে তেহট্টে গিয়েছিলেন। তাতে কি রাজ্য প্রশাসনের মর্যাদা বাড়লো? হলদিয়া থেকে ফেরার পথে মালা রায়ের গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছিল। এরপর যখন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের কাছ থেকে রিপোর্ট চাইবেন— তখন কি করবেন রাজ্যপাল?

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নানান বক্তব্য এবং কর্মকাণ্ড সিপিএমকে বিরাট ভাবে সাহায্য করছে আর রাজ্যে কংগ্রেসের ঝিমিয়ে পড়া ভাব কাটাতে সাহায্য করছে। এর ফলে জল কতদূর গড়াবে সেটা ভবিষ্যতে দেখা যাবে, তবে সেটা যে মমতার অনুকূল হবে না এটা বলে দেওয়া যেতে পারে।

বিপন্ন ভারতীয় অর্থনীতি

অম্লানকুসুম ঘোষ

রাষ্ট্রকে যদি একটি মানবশরীরের সঙ্গে তুলনা করা হয় তা হলে অর্থনীতি হলো সেই শরীরের ফুসফুস। ফুসফুস আক্রান্ত হলে যেমন গোটা শরীরই ভেঙে পড়ে সেরকম কোনও রাষ্ট্রের অর্থনীতি সমস্যাসঙ্কুল হলে সেই রাষ্ট্র সবদিক দিয়েই ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়। বর্তমানে ভারতীয় অর্থনীতি নানাবিধ বিপদের সম্মুখীন যা দেশের ভবিষ্যতকে বিরাট প্রশ্নচিহ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। সেই বিপদগুলি একে একে পর্যালোচনা করে দেখা যাক।

ভারতীয় অর্থনীতির প্রথম এবং প্রধান বিপদ হলো দুর্নীতি। গত সাত-আট বছরে ঘটে যাওয়া সীমাহীন দুর্নীতি প্রচারমাধ্যমের এবং বেশ কিছু সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের সৌজন্যে গত এক দেড় বছরে জনসাধারণের গোচরে এসেছে। লক্ষকোটির অঙ্কে ঘটে যাওয়া সেই দুর্নীতির অর্থ সরকারের হাতে থাকলে এই দরিদ্র দেশের কি কি ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটতে পারতো তা নিয়ে জল্পনাও হয়েছে অনেক। কিন্তু জাতীয় অর্থনীতিতে দুর্নীতির মূল ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশি ও সুদূরপ্রসারী। নিছক পাটিগণিতে সেই ক্ষতিকে বোঝা যাবে না। সেইসব ক্ষতিগুলি পর্যালোচনা করা যাক। প্রথমত, টু জি বা কয়লা সংক্রান্ত দুর্নীতিগুলি ঘটার এবং ঘটার বেশ কিছু বছর পরে তা প্রকাশিত হওয়ার ফলে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ বন্টন ও উন্নয়ন সংক্রান্ত বেশ কিছু পদক্ষেপ সরকারকে প্রত্যাহার করতে হয়েছে। ফলে একদিকে যেমন সরকারি রাজস্বের ক্ষতি হয়েছে এবং কাজগুলির জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে অন্যদিকে তেমন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সঙ্গে জড়িত অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রের বৃদ্ধিও ব্যাহত হয়েছে। দুর্নীতি যখন ঘটেছিল তখন নিশ্চয়ই তা সরকারের গোচরেই ঘটেছিল, সেই সময়েই সরকার উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করলে এই অনুসারী ক্ষতিগুলি হোত না এবং জাতীয় অর্থনীতিও এতটা মন্দাক্রান্ত হোত না। দ্বিতীয়ত, একের পর এক দুর্নীতির ফলে দেশের ভাবমূর্তি বিদেশের কাছে কালিমালিপ্ত হয়েছে আর তাই সৎ বিনিয়োগকারীরা ভারতকে তাদের বিনিয়োগের উপযুক্ত বলে মনে করছে না, ফলস্বরূপ বিনিয়োগ কমছে এবং কর্মসংস্থান কমছে। অর্থনীতির এই দ্বিমুখী ক্ষতির প্রভাব কিন্তু শুধুমাত্র বর্তমানে সীমাবদ্ধ নেই, অদূর ভবিষ্যৎ-ও এর হাত থেকে রেহাই পাবে না।

> অর্থনৈতিক বৈষম্য একটি সামাজিক অপরাধ, ভারতের মতো ঘোষিত কল্যাণরাষ্ট্রে এই বৈষম্য অত্যন্ত অনুচিত। তাছাড়া এর ফলে জনমানসে দেখা দেয় ঈর্ষা, যা থেকে সৃষ্টি হয় নানা অপরাধ। ফলে দেশে বিনিয়োগ-সৃষ্টির সম্ভাবনা কমে যায়, সঞ্চিত অর্থের নিরাপত্তা না থাকায় সঞ্চয়ের অভ্যাসও হ্রাস পায়। যা মুমূর্ষু অর্থনীতির কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দেয়।

ভারতীয় অর্থনীতির আরেকটি বড় বিপদ হলো নিয়ন্ত্রণহীন উদার অর্থনীতি। কেন্দ্রীয় সরকারের সাম্প্রতিক সংস্কারের ধাক্কায় ‘উদার অর্থনীতি’ সম্পর্কে এখন সবাই ওয়াকিবহাল। উদার উর্থনীতির পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি ও তথ্যের ঝড় বয়ে গেছে বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমে। কিন্তু একটা বিষয় সকলেই এড়িয়ে গেছেন। অর্থনীতির পথে যাই হোক সেই পথে অর্থনীতি কিভাবে চালিত হচ্ছে তার ওপরেই নির্ভর করে দেশের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ কতটা উজ্জ্বল হবে। অতি নিয়ন্ত্রিত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি বা একেবারেই নিয়ন্ত্রণহীন উদার অর্থনীতি কোনওটিই এককভাবে দেশকে সমৃদ্ধ করতে পারে না। দেশের প্রয়োজনমতো কখনও নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি, কখনও উদার অর্থনীতির সঠিক ব্যবহারই দেশকে ‘ধনধান্য পুষ্পভরা’ করে তুলতে পারে। ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করা যাক। স্বাধীনতার পর থেকে প্রথম চুয়াল্লিশ বছর দেশের অর্থনীতি চালিত হয়েছে নিয়ন্ত্রিত সমাজতান্ত্রিক পথে। এই চুয়াল্লিশ বছরে দেশের বার্ষিক জি ডি পি গ্রোথ রেট তিন থেকে সাড়ে চার শতাংশের মধ্যে ঘোরাফেরা করেছে। দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থানকারী মানুষের শতাংশ মোটামুটি একই থেকেছে কিন্তু লাইসেন্সরাজ, পারমিটরাজের কল্যাণে দুর্নীতি হয়েছে সীমাহীন। অসাধু ব্যবসায়ী-আমলা-রাজনীতিবিদ, এই অক্ষের মধ্যে পড়ে দেশের অর্থনীতি ও দরিদ্র-মধ্যবিত্ত মানুষ চুয়াল্লিশ বছর ধরে কেঁদেছে। অবশেষে ১৯৯১ সাল থেকে দেশের অর্থনীতি চালিত হয়েছে নিয়ন্ত্রণহীন বাজারমুখী পথে। বার্ষিক জি ডি পি গ্রোথ রেট বেড়ে পাঁচ থেকে আট শতাংশের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করেছে, কিন্তু অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীভূত হয়নি বরং তা প্রকটতর হয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক

সমৃদ্ধির যাবতীয় সুফল আবদ্ধ থেকেছে জনসংখ্যার একটি নির্দিষ্ট বৃত্তের ভেতর। মূলত, বড় ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ ও চিত্রতারকারা এই সুফল করায়ত্ত করেছে। সুফলের কিয়দাংশ সরকারি কর্মী, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার কর্মী ও অন্যান্য সংগঠিত কর্মীরাও পেয়েছেন কিন্তু তার বাইরে দেশের জনসংখ্যার সিংহভাগ রয়ে গেছে সেই অন্ধকারেই। তাই তো আজ যখন দেশের মানুষের মাথাপিছু গড় বার্ষিক আয় পঁচাত্তর হাজার টাকা তখনই দেশের সাতচল্লিশ শতাংশ মানুষের দৈনিক আয় আঠাশ টাকার কম। উদার অর্থনীতি প্রযুক্ত হওয়ার সময়ে এর প্রবক্তারা বলেছিলেন 'উন্নয়ন চুঁইয়ে নামবে' অর্থাৎ রাষ্ট্রের এক অংশ প্রথমে ধনী হবে তারপর তাদের সঙ্গে অর্থনৈতিক আদানপ্রদানে ধনী হবে রাষ্ট্রের বাকি সকলে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। দেশের অর্থনৈতিক প্রাঙ্গণে তাই আজও প্রদীপের নীচেই অন্ধকার। অর্থাৎ দেখা গেল সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও উদার অর্থনীতি দু' ধরনের অর্থনীতিই ভারতে পরীক্ষিত। কিন্তু দেশের উন্নতি হয়নি কোনও পদ্ধতিতেই। অর্থাৎ বলা যায় দোষটা অর্থনৈতিক পদ্ধতির নয়, দোষটা প্রয়োগকৌশলের। বিশ্ব অর্থনীতির দিকে চোখ ঘুরিয়ে দেখা যাক। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রয়োগে ধ্বংস হয়ে গেছে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের নানা দেশের অর্থনীতি, অথচ এই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রয়োগেই এক সময় ইন্দোনেশিয়াসহ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কিছু দেশ নিজেদের করেছিল সমৃদ্ধতর। উদার অর্থনীতির প্রয়োগে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম ইউরোপ ও জাপান নিজেদের নিয়ে গিয়েছিল সমৃদ্ধির চূড়ায়, আবার এই উদার অর্থনীতির প্রয়োগেই এক সময় পতনের দিকে এগিয়েছিল দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনাসহ কিছু দেশ। অতএব এর থেকেও বোঝা গেল ব্যর্থতাটা নীতির নয়, প্রয়োগের। এককথায় বলা যায় মানুষের ব্যক্তিগত নৈপুণ্য ও উদ্যমকে স্বাধীনভাবে দেশের শ্রীবৃদ্ধির কাজে লাগানোর জন্য উৎপাদন ক্ষেত্রকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণহীন করা উচিত। উদার অর্থনীতির খোলা হাওয়ায় ব্যক্তিমানুষের স্বকীয় প্রতিভা বিকশিত হয়ে বাড়িয়ে তুলবে দেশের মোট উৎপাদন। আবার এই উৎপাদন বৃদ্ধির সুফল যাতে দেশের সবাই পায় তা নিশ্চিত করতে বন্টনব্যবস্থাকে রাখা উচিত রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে। তাহলে বন্টনব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির কঠোর নিয়ন্ত্রণে থেকে ধমনীনিয়ন্ত্রিত রক্তপ্রবাহের মতো গোটা দেশের সমগ্র অর্থনীতিতে সমৃদ্ধিকে ছড়িয়ে দিতে পারে। এভাবে অধিক উৎপাদন ও ন্যায়সঙ্গত বন্টনব্যবস্থা একত্রে দেশের অর্থনীতিকে স্বর্ণযুগে পৌঁছে দিতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য স্বাধীনতার পরপরই নেহরু জমানায় করা হয়েছিল এর ঠিক বিপরীত। উৎপাদনব্যবস্থাকে রাখা হয়েছিল কঠোর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে আর বন্টন ব্যবস্থায় ছিল কিছুটা হলেও প্রতিযোগিতার সুযোগ। তার বিষময় ফল ছাপ রেখেছে ভারতীয় অর্থনীতির সর্বাঙ্গে। সেই অদ্ভুত মিশ্র অর্থনীতির ফল ভোগ করেছে আমাদের আগের প্রজন্ম, ভোগ করছে বর্তমান প্রজন্মও। আর এখন, নিয়ন্ত্রণহীন উদার অর্থনীতিকে আবাহন করা হচ্ছে, উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে বন্টন ব্যবস্থাও খুলে দেওয়া হয়েছে দেশী-বিদেশী পুঁজিপতিদের কাছে। উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত পুঁজি থাকলে পুঁজিপতি এবং দক্ষ বা অদক্ষ কর্মীরা নিজেদের স্বার্থেই উৎপাদনের পরিমাণ বা গুণগত মান বাড়াতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু বন্টনব্যবস্থায় অবাধ ব্যক্তিগত পুঁজি থাকলে পুঁজিপতিরা নিজেদের স্বার্থে প্রথমে ছোট প্রতিযোগীদের বাজার থেকে বিতাড়িত করে নিজেদের অর্থবলে উৎপাদক ও ক্রেতাকে সাময়িকভাবে লাভবান করে। একে অর্থনৈতিক পরিভাষায় ডাম্পিং বলা হয়। এর ফলে শুধু প্রতিযোগীরাই বাজার থেকে নিষ্ক্রান্ত হয় তা নয়, উৎপাদক আর ক্রেতারাও সেই বন্টনসংস্থার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তখন বন্টনসংস্থাটি দ্বিতীয় পর্যায়ে উৎপাদক ও ক্রেতার মধ্যে এক দুস্তর ব্যবধান গড়ে তোলে। উৎপাদকের কাছ থেকে ক্রয়ের মূল্য ক্রমাগত কমে যায় আর ক্রেতার কাছে বিক্রয়ের মূল্য ক্রমাগত বেড়ে যায়। সংস্থাটি লাভবান হয় আর উৎপাদক-ক্রেতা সহ সমগ্র অর্থনীতি ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। অর্থাৎ স্বল্পমেয়াদী ক্ষেত্রে লাভ হলেও দীর্ঘমেয়াদী ক্ষেত্রে অর্থনীতির জন্য বিপদ বয়ে আনে নিয়ন্ত্রণহীন বন্টনব্যবস্থা। তাই একথা বলা যায় বন্টনব্যবস্থায় অবাধ প্রবেশকে স্বীকৃতিদানের মাধ্যমে যে বিষবৃক্ষের চারা রোপণ করা হলো তার ফল ভোগ করবে ভাবীকাল।

ভারতের অর্থনৈতিক শিরঃপীড়ার আর একটি কারণ হলো মুদ্রাস্ফীতি। মুদ্রাস্ফীতি দু' ধরনের হয়। এক হলো স্বাভাবিক মুদ্রাস্ফীতি। স্বাভাবিক মুদ্রাস্ফীতি উৎপাদনের খরচ বৃদ্ধি, পরিবহণের খরচ বৃদ্ধি এবং চাহিদা-জোগানের সাময়িক অসামঞ্জস্য ইত্যাদি নানা কারণে হয়ে থাকে। স্বাভাবিক মুদ্রাস্ফীতির হার সাধারণতঃ দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে বর্তমান থাকে। স্বাভাবিক মুদ্রাস্ফীতি দেশের অর্থনীতির পক্ষে ক্ষতিকর তো নয়ই বরং তা অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকে সাহায্য করে। আরেক ধরনের মুদ্রাস্ফীতি হলো কৃত্রিম মুদ্রাস্ফীতি। চাহিদা-জোগানের বাজারে মধ্যস্বত্বভোগীরা কখনও কৃত্রিম চাহিদা- বৃদ্ধির মাধ্যমে, কখনও বা অতিরিক্ত মজুতের দ্বারা জোগান হ্রাস করে বাজারের মোট চাহিদা-জোগানের ভারসাম্যকে নষ্ট করে। ফলে মুদ্রাস্ফীতি জাতীয় অর্থনৈতিক বৃদ্ধির চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে হয় এবং জি ডি পি গ্রোথ রেটের সঙ্গে ব্যস্তানুপাতে থাকে। বর্তমানে ভারতে যে মুদ্রাস্ফীতি দেখা যাচ্ছে তা এই কৃত্রিম মুদ্রাস্ফীতি, তাই জি ডি পি গ্রোথ রেট নিম্নাভিমুখী হলেও মুদ্রাস্ফীতি ঊর্ধ্বাভিমুখী থাকছে। এই কৃত্রিম মুদ্রাস্ফীতি বজায় থাকলে জাতীয় অর্থনীতির দ্বিমুখী ক্ষতি হয়। প্রথমত, ক্রয়যোগ্য বস্তুর দাম অত্যধিক বাড়ায় ক্রেতাসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়, ফলে চাহিদা হ্রাস পায় এবং উৎপাদিত বস্তুর সদ্ব্যবহার হয় না, এতে উৎপাদক উৎপাদনে উৎসাহ হারায় ফলে দেশের মোট উৎপাদন হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয়ত, ক্রয়জনিত খরচ বেড়ে যাওয়ার ফলে সাধারণ মানুষের সঞ্চয়ক্ষমতা হ্রাস পায় অর্থাৎ দেশের মোট সঞ্চয় কমে ফলে বিনিয়োগ কমে যায়। এর

ফলে কর্মসংস্থান হ্রাস পায় অর্থাৎ বেকারি বাড়ে। অতএব বলা যায় কঠোর ও নিখুঁত প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে এই কৃত্রিম মুদ্রাস্ফীতিরূপ অসুরকে দমন করতে না পারলে দেশের অর্থনৈতিক ভাগ্যাকাশে দেখা দেবে দুর্যোগের ঘনঘটা।

অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা জাতীয় অর্থনীতির আরেকটি বড় ঝুঁকি। অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা বা তার কুফল প্রকাশ্যে ততটা ভয়ংকর বলে মনে হয় না। কিন্তু প্রচ্ছন্নভাবে তা অর্থনীতিকে ঝাঁঝরা করে দেয়। অর্থনীতির বেশ কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম আছে সেই নিয়মের ওপর ভিত্তি করে অর্থনীতির বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থানকারী প্রতিটি একক পারস্পরিক সংযোগ বজায় রাখে এবং এর ওপর ভর করেই অর্থনীতি সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু সেই নিয়মগুলি যদি ব্যাপকভাবে লঙ্ঘিত হয় তা হলে অর্থনীতির স্বাভাবিক ছন্দ বা প্রবাহ ব্যহত হয় ফলে অর্থনীতি ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়। তাই অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলাকে অর্থনীতির নিঃশব্দ ঘাতক বলা যায়। একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝা যাক। যে কোনও অর্থনীতিতে মেরুদণ্ডের কাজ করে ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা। আমানতকারীরা তাদের উদ্বৃত্ত অর্থ ব্যাঙ্কে জমা রাখে প্রয়োজনমতো সুদসহ ফেরৎ পাবে এই নিয়মের ওপর ভরসা করে। ব্যাঙ্ক আবার সেই অর্থ লগ্নিকারীকে ধার দেয় সময়মতো সুদসহ ফেরত পাবে এই নিয়মের ওপর ভরসা রেখে। এভাবেই সঞ্চয় বিনিয়োগে পরিণত হয়। দেশের অর্থনীতিও এগিয়ে চলে। কিন্তু যদি লগ্নিকারীরা ব্যাঙ্ককে টাকা ফেরত না দিয়ে অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে তাহলে ব্যাঙ্কও আমানতকারীকে টাকা ফেরত দিতে ব্যর্থ হবে। ফলে নতুন আমানতকারীরাও ব্যাঙ্কের থেকে বিমুখ হবে, ফলে ব্যাঙ্কও নতুন লগ্নিকারীদের ঋণ দিতে ব্যর্থ হবে। অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থাই উঠে যাবে। ফলে অর্থনীতির একপ্রান্তের উদ্বৃত্ত অর্থ ও অন্যপ্রান্তের অর্থের চাহিদা, এই দুইয়ের মধ্যে যোগসূত্র হারিয়ে যাবে। অর্থনীতির বিকাশ ব্যহত হবে। এভাবে অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার হাতে অর্থনীতি বিধ্বস্ত হবে। বর্তমানে আমাদের দেশে এই প্রবণতা ভীষণভাবে দেখা যাচ্ছে। অর্বুদপতি শিল্পপতি থেকে ছোট জোতের চাষি, চাকুরীরত গৃহনির্মাতা থেকে অধ্যয়নরত ছাত্র, সকলেরই ব্যাঙ্কঋণ ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভারতে ব্যবসারত সবকটি ব্যাঙ্কের ব্যালেন্স সীটের দিকে নজর দিলেই বোঝা যাবে এই প্রবণতা ক্রমশ কত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। দুঃখের ব্যাপার সরকার এই প্রবণতার বিরোধিতা না করে নানাস্তরে এই প্রবণতাকেই উৎসাহ দিচ্ছে। আবেগনির্ভর এই উৎসাহদান স্বল্পমেয়াদে ক্ষুদ্রস্বার্থ সিদ্ধির সহায়ক হলেও সামগ্রিকভাবে তা জাতীয় অর্থনীতির নিঃশব্দ মৃত্যু ডেকে আনবে।

অর্থনীতির আরেকটি বিপদ হলো বিপুল পরিমাণ রাজকোষ ঘাটতি। বিষয়টি বহুচর্চিত তবু এ ব্যাপারে একটু আলোকপাত করা যাক। সরকারের মোট ব্যয় ও সরকারের মোট আয়ের পার্থক্যকে রাজকোষ ঘাটতি বলা হয়। এই ঘাটতি একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু গত কয়েকবছর ভারতের রাজকোষ ঘাটতি পাহাড়প্রমাণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বিপুল পরিমাণ রাজকোষ ঘাটতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সরকার বাধ্য হয়ে অতিরিক্ত টাকা ছাপাচ্ছে ফলে টাকার অবমূল্যায়ন ঘটছে, মুদ্রাস্ফীতি বাড়ছে, অন্য নানাবিধ আনুষঙ্গিক সমস্যা অর্থনীতিকে আচ্ছন্ন করছে। সরকারের মোট ব্যয় কমানোর জন্য সরকার নানা পদক্ষেপ করছে যা সাধারণ মানুষের স্বার্থে আঘাত হানছে, যেমন, পেট্রোপণ্যের দাম বাড়ানো ইত্যাদি। কিন্তু কৌশলগত কিছু পরিবর্তন করলে সাধারণ মানুষের স্বার্থে ঘা না দিয়েও সরকারি ব্যয় কমানো যেত। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায় ভারতে ডিজেলের সবচেয়ে বড় ক্রেতা ভারতীয় রেল। ভারতীয় রেলের সবকটি ট্রেনকে (মালগাড়ি সমেত) বিদ্যুৎচালিত করার একটি প্রকল্প বছরদশেক আগে নেওয়া হয়েছিল, সেটি কোনও অজ্ঞাত কারণে বাস্তবায়িত হয়নি। ভারতীয় রেলের সবকটি ট্রেন বিদ্যুৎচালিত হলে রেলকে আর ডিজেল কিনতে হোত না, দেশে ডিজেলের মোট চাহিদা অনেক কমে যেত, ফলে সরকার জনস্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্ত না নিয়েও সরকারি ব্যয় কমাতে পারতো। একইরকমভাবে কৃষিসেচে সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিকরণ ইত্যাদি নানা পথে দেশে পেট্রোপণ্যের চাহিদা কমানো যায়। আবার বিলাসকরের হার বাড়ানো, আয়কর বা অন্যান্য ক্ষেত্রে, উর্ধ্বক্ষেত্রে করকাঠামোয় পরিবর্তন করা ইত্যাদির দ্বারাও সরকারের আয় বাড়ানো যায়। সরকারের আয়-বৃদ্ধি ও ব্যয়-হ্রাস হলে রাজকোষ ঘাটতিও কমে আবার পেট্রোপণ্যের চাহিদা কমায় দেশের আমদানি খরচ হ্রাস পায়, এভাবে ক্রমবর্ধমান বৈদেশিক ঋণের হাত থেকেও মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু অর্থনীতির কোনও স্তরেই এই উদ্যোগগুলি দেখা যাচ্ছে না। প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের বদলে জনস্বার্থহানিকর ভর্তুকি ছাঁটাইয়ের পথে হাঁটছে সরকার, যা অর্থনৈতিকই বৈষম্যকে আরও প্রকট করছে।

ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক বৈষম্য দেশের অর্থনীতির অবধারিত পতনকে আরও ত্বরান্বিত করছে। প্রথমত, অর্থনৈতিক বৈষম্য একটি সামাজিক অপরাধ, ভারতের মতো ঘোষিত কল্যাণরাষ্ট্রে এই বৈষম্য অত্যন্ত অনুচিত। তাছাড়া এর ফলে জনমানসে দেখা দেয় ঈর্ষা, যা থেকে সৃষ্টি হয় নানা অপরাধ। ফলে দেশে বিনিয়োগ-সৃষ্টির সম্ভাবনা কমে যায়, সঞ্চিত অর্থের নিরাপত্তা না থাকায় সঞ্চয়ের অভ্যাসও হ্রাস পায়। যা মুমূর্ষু অর্থনীতির কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দেয়।

সংক্ষেপে বলা যায়, অর্থনীতির প্রয়োগজনিত ত্রুটিসঞ্জাত কারণে ভারতের ভাগ্যাকাশে যে বিপর্যয়রূপ দুর্যোগের কালো মেঘ দেখা যাচ্ছে তা ভবিষ্যৎকে কতখানি প্রভাবিত করবে সে প্রশ্নের উত্তর হয়তো মহাকালের গর্ভে নিহিত, তবে বর্তমান বড় সুখের সময় নয়।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

ইউ পি এ সরকারকে অপসারণ করব কীভাবে?

ডঃ সুব্রহ্মনিয়াম স্বামী

আঘাতকে ছোট করে দেখছেন। যেমন পুণের বিস্ফোরণকে বলছেন, 'ছোট ধরনের বিস্ফোরণ' (যেহেতু জওহরলাল নেহরু, ইন্দিরা গান্ধী ও সোনিয়া গান্ধী নিয়ন্ত্রিত রাজনীতি ভারতবর্ষের পক্ষে সবচেয়ে ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে)। এঁদের রাজনীতির মূলকথা হলো নীতিহীনতা, জাতীয় আকাঙ্ক্ষার উপর ব্যক্তিগত স্বার্থ চাপানো এবং দুর্নীতি।

নীরবে লক্ষ্য করছি সন্ত্রাসবাদীদের আমরা এতটুকু বাধা দিচ্ছি না, উপরন্তু বন্দি সন্ত্রাসবাদীদের রাষ্ট্রীয় অতিথির সম্মান দিচ্ছি। পুণে বা কোকরাঝাড়ে যা ঘটেছে তাতে দেশপ্রেমিকদের ঘুম ভাঙবে। আমি বেশ কিছু 'মডারেট' বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি তারা আমাদের দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি উদাসীন। কোকরাঝাড়ে যে দাঙ্গা সে বিষয়ে বলছেন ও তো 'গোষ্ঠী সংঘর্ষ'—ও তো হতেই পারে। আমেরিকার উইসকোন্সিন শহরে নির্দোষ শিখদের হত্যা

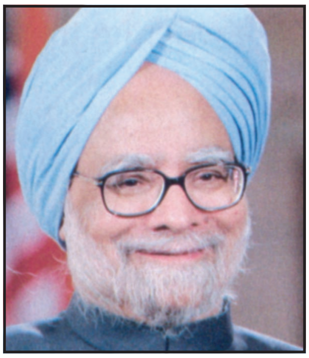

সম্বন্ধে তাঁদের বক্তব্য ওরা কেন ওসামা বিন লাদেনের মতো দাড়ি রেখেছে? ইত্যাদি। মোট কথা হলো নেহরুবাদ আমাদের জাতীয়তাবাদের মূলে কুঠারাঘাত করেছে।

আজ শ্রীমতী সোনিয়া এডুইজ আলবিনা আমোনিয়া মাইনো গান্ধী আমাদের দেশে প্রধানমন্ত্রিত্বের আদর্শটি গুঁড়িয়ে দিয়েছেন পি এম ও এবং এন এ সি-র দ্বৈতশাসন সৃষ্টি করে। মনোমোহন সিং ও তাঁর ক্যাবিনেট সহকর্মীরা রিং লিডারের সামনে সার্কাসের সিংহদের মতো আচরণ করছেন।

কথা হলো এখন আমরা কী করব? দেশপ্রেমিকদের উচিত হবে সরকারকে দ্রুত নির্বাচন করাতে বাধ্য করা। ২০১৪-র নির্বাচন দূরে নয়। একজন নিষ্ঠাবান গণতান্ত্রিক হিসেবে আমার মত হলো আমাদের আমৃত্যু অনশনের ভড়ং ত্যাগ করা— যে অনশনে কিনা আয়ুর্বেদ ভিত্তিক জল ব্যবহার করা হয়। ভারতীয় গণতন্ত্র টিকে

আছে কারণ দেশের আপামর জনতা এখনও বাস্তববাদী যা আমরা ১৯৭৭ সালে প্রত্যক্ষ করেছিলাম।

নেহরুসৃষ্ট আবর্ত থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র উপায় হলো লোকসভার সাধারণ নির্বাচন। জয়প্রকাশ নারায়ণ আমাকে ১৯৭৭ সালে বলেছিলেন আর এস এস-এর সাংগঠনিক নেটওয়ার্ক এমন একটি শক্ত বুনিয়াদ যার উপরে নেহরু সৃষ্ট চাতুর্য হালে পানি পাবে না।

কিন্তু ক্ষমতা দখলই যথেষ্ট নয় যদি পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী নেহরুর সস্তা অনুকারী হন বা নেহরুর চিন্তাধারায় আপ্লুত হন— যা আমরা অতীতে দেখেছি। ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার প্রবণতার নামই নেহরুবাদ।

এখন আমাদের দরকার নতুন ধরনের রাজনীতি। রাজনীতি হলো সংঘবদ্ধ সভ্য সমাজ পরিচালনার পদ্ধতি। সমাজ যে দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে তার উপর রাষ্ট্র পরিচালনার রীতিনীতি নির্ভর করে। এবং

রাষ্ট্রপরিচালনায় রীতিনীতি গণতান্ত্রিক ও স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পার্থক্যের জন্য স্বতন্ত্র হতে বাধ্য। অতএব আমাদের রাষ্ট্রনীতি নির্ভর করে আমরা যে রাজনৈতিক মতাদর্শ গ্রহণ করেছি তার উপর।

আমি বলতে চাই যে আমাদের রাজনীতি আদর্শনিষ্ঠ হতে পারে যদি আমরা ভারতীয় সত্তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হই।

আমি সবাইকে উদ্দেশ্য করে এই কথাটা বলতে চাই যে গণতন্ত্রের মৌলিক অধিকার রক্ষার মধ্যে নিহিত রয়েছে ভারতের অখণ্ড ঐক্য। এই ঐক্যের ধারণা স্পষ্ট হয়ে থাকে মানবাধিকারের নীতির দ্বারা।

ঐক্যের প্রতি আস্থাশীল হওয়ার জন্য আমরা এদেশের জল, নদী, আমাদের হাজার হাজার বছরের পুরানো সভ্যতার সঙ্গে একাত্ম্য হতে পারি। এই একাত্মবোধ বিকাশের জন্য আমাদের নিম্নলিখিত শর্ত মেনে চলতে হবে।

প্রথম, ভারতের সঙ্গে একাত্ম্য হবার সংজ্ঞা। ভারত হলো হিন্দুস্থান —হিন্দুদের দেশ। এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা যারা সগর্বে মনে করে যে তাদের পূর্বপুরুষ হলো হিন্দু। এটা তাদেরও দেশ। মুসলিম এবং খৃস্টানরা যদি এই সত্য শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করে তবে

তারাও হিন্দুস্থানের অঙ্গ। এর অর্থ হলো আমরা দীর্ঘ বিরামহীন গৌরবজনক সভ্যতার উত্তরাধিকারী।

নোঙর ছাড়া ভারত যদি অতীতে সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয় তবে সেটা হবে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও নব্যসাম্রাজ্যবাদীদের ক্রীড়াভূমি যারা কিনা ভারতকে অভিবাসীদের স্থান বলে মনে করে।

তাদের মতে ভারত জাতি নয়— লোক ভর্তি একটা স্টেশন। ভারত ধূসর অতীতের সঙ্গে যুক্ত। আবার বলি ভারত হিন্দুদের দেশ তো বটেই এবং তাদের— যেমন মুসলিম ও খৃস্টানদের— যারা হিন্দুদের তাদের পূর্বপুরুষ বলে মনে করে। এই সত্য ইহুদি ও পার্সীদের বেলায়ও প্রযোজ্য।

দুঃখের বিষয় এই সত্যটি এখনও মেনে নেওয়া হয়নি এবং এর ফলে অখণ্ড সর্বাত্মক ভারতীয়ত্বের ধারণা দানা বাঁধতে পারছে না। আমরা মুসলিম এবং খৃস্টানদের আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে তখনই গ্রহণ করব যখন তারা সগর্বে এই সত্য গ্রহণ করবে আর ভাববে যে ধর্ম পরিবর্তনের সঙ্গে সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের পরিবর্তনের কোনও সম্পর্ক নেই। ভারতের সাংস্কৃতিক একাত্মতা বলতে অবিসংবাদিতভাবে স্পষ্টরূপে হিন্দুত্বকে বোঝায়। এবং এই হিন্দুত্বের মূল রয়েছে বেদের মূল্যবোধ।

সামগ্রিক হিন্দুত্বের ধারণাকে ব্যঙ্গ করা হয়। এমনকি মৌলবাদী বলা হয়। শত্রুরা বিজেপি দলের নেতাদের প্রায়শই নির্বাচনে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য হিন্দুত্বকে পরিহার করার কথা বলেন। শত্রুদের তরফ থেকে এই শুকনো উপদেশটিকে ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। এই বিষয়ে বিতর্কের কোনও প্রয়োজন দেখি না, কারণ এতে করে ভোটার ও ক্যাডারদের মধ্যে সুসম্পর্ক তথা দেশপ্রেমের আদর্শের মধ্যে চিড় ধরে।

এর ফলে আমরা অগণিত ছাগল ও মেষের মতো হব এবং একটা বাঘ বা হায়েনাকে দেখে পালিয়ে যাব। অথবা আমরা ভাল খেয়ে মোটা হওয়া সার্কাসের সিংহের মতো হব যদিও শারীরিক দিক দিয়ে দুর্বল রিং মাস্টারের নির্দেশ মেনে চলব। হিন্দু সমাজ আজ ঐক্যবদ্ধ নয়। ফলে এটি ক্রমাগত খণ্ড খণ্ড হয়ে যাচ্ছে। মজার কথা এই অবক্ষয়ের পাশাপাশি লক্ষ লক্ষ হিন্দুরা নিয়মিত মন্দিরে যাচ্ছে।

হ্যাঁ, আজ আমরা এমন এক মানসিকতা তৈরি করব যাতে কিনা আঘাত পেলে প্রত্যাঘাত করতে পারি। আর এই আত্মরক্ষামূলক প্রতিরোধ এমনি জোরদার হবে যাতে ভবিষ্যৎ আঘাত আর না আসে। যদি সন্ত্রাসবাদীরা পাকিস্তান, বাংলাদেশ বা শ্রীলঙ্কার প্রশিক্ষণ ক্যাম্প থেকে আসে তাহলে আমরা কোনও কিছুর পরোয়া না করে ওদের প্রশিক্ষণ ক্যাম্প গুঁড়িয়ে ফেলব। যদি উগ্রপন্থীরা পাঁচ লক্ষ কাশ্মীরি হিন্দুদের কাশ্মীর উপত্যকা থেকে বিতাড়িত করে তাহলে আমরা দশ লক্ষ এক্স সার্ভিসম্যানদের অস্ত্র ও অর্থে সুসজ্জিত করে সপরিবারে সেই বিতাড়িত কাশ্মীরিদের ফেলে আসা এলাকায় পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করব---অবশ্যই সংবিধানের ৩৭০ ধারার আওতায় রেখে।

যদি বাংলাদেশ ভারতে অনুপ্রবেশ ঘটায় তাহলে ভারত জুন ১৯৪৭ সালের ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্ট অনুযায়ী বাংলাদেশের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে জমি চাইতে পারে। এই অ্যাক্ট তৈরি হয়েছিল জিন্নার দাবি মেনে। জিন্না চেয়েছিলেন হিন্দুদের 'আধিপত্য' থেকে আত্মরক্ষার জন্য মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান নামে বাসভূমি। এবং তা ভারতকে খণ্ডিত করে। মজার কথা

> **মুসলিমরা তাদের সুবিধা অনুযায়ী অভিন্ন সিভিল কোড ব্যবহার বা বর্জন করে, এমন কি যদি তা শরিয়তের বিরুদ্ধেও যায়। উদাহরণ স্বরূপ, তারা অভিন্ন ক্রিমিনাল কোড গ্রহণ করছে শরিয়ত-বিরুদ্ধ হলেও। আবার শরিয়ত-বিরুদ্ধ এই অজুহাতে তারা অভিন্ন সিভিল কোড মেনে নিতে চাইছে না। বলা ভাল— মুসলিমরা অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা এমনকি জার্মানি ও জাপানেও অভিন্ন সিভিল কোড গ্রহণ করেছে।**

Design's For Modern Living
Neycer
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
Sales Office : 15, College Street, Kolkata-700012
Ph : 2241-7149 / 8174, 2237-1521
54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831 / 33

হলো দেশভাগের ষাট বছরের মধ্যে বাংলাদেশের এক তৃতীয়াংশ মুসলমান ভারতে অনুপ্রবেশ করেছে হিন্দুদের ‘আধিপত্য’ মেনে নিয়ে।

যারা ভারতকে দুর্বল ও অনুগৃহীত দেখতে চায় তাদের দৃষ্টিভঙ্গী আগের মতোই রয়ে গেছে— তারা এখনও চায় ভারত তার ঐতিহ্যকে পদদলিত করে আত্মসম্মান খোয়াক। ঠিক এইটিই ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গী। এই দৃষ্টিভঙ্গী ছিল তাদের ভারত জয়ের মূলে। খালি পদ্ধতিটাই যা পাল্টেছে। এর পাশাপাশি যে সমস্যাটা লঘু করে দেখার মতো নয় তা হলো হিন্দুদের অনৈক্য এবং নির্বাচনের সময় মুসলমান ও খৃস্টানদের মিলিত ভোট, যা এই দুই সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে শক্তি যুগিয়েছে। এই শক্তির জন্য অভিন্ন সিভিল কোড সংবিধানের ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপ্যাল অফ স্টেট পলিসির অঙ্গ হলেও এটি প্রয়োগ করা যাচ্ছে না। মুসলিমরা তাদের সুবিধা অনুযায়ী অভিন্ন সিভিল কোড ব্যবহার বা বর্জন করে, এমন কি যদি তা শরিয়তের বিরুদ্ধেও যায়। উদাহরণ স্বরূপ, তারা অভিন্ন ক্রিমিনাল কোড গ্রহণ করছে শরিয়ত-বিরুদ্ধ হলেও। আবার শরিয়ত-বিরুদ্ধ এই অজুহাতে তারা অভিন্ন সিভিল কোড মেনে নিতে চাইছে না। বলা ভাল— মুসলিমরা অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা এমনকি জার্মানি ও জাপানেও অভিন্ন সিভিল কোড গ্রহণ করেছে।

গণতন্ত্রে জাতীয় জাগরণের কর্মসূচিকে রূপ দেবার লক্ষে নির্বাচন খুব জরুরি। সে কারণে সনাতন ধর্মে যারা বিশ্বাসী তাদের নিয়ে একটি ব্লক তৈরি করতে হবে। যদি ভারতের অর্ধেক মানুষও নির্বাচনের সময় এই ব্লকে ভোট দেয় তাহলে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন সম্ভব। এভাবেই আমরা যারা আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য এবং জাতীয় জাগরণের উদ্‌বোধন দেখতে চাই তাদের স্বপ্ন সফল হবে।

ব্যক্তিগতভাবে আমার পরামর্শ হলো আগামী নির্বাচনে এন ডি এ হিন্দু আদর্শ জলাঞ্জলি না দিয়ে আসন সমঝোতা করে লড়ুক। এন ডি এ-র ছটি দলের মধ্যে পাঁচটি দলই জাতীয় অখণ্ডতার লক্ষ্যে হিন্দুত্বের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। ষষ্ঠ দলটি সরকার পরিচালনের অভিন্ন নীতি নিয়ে এই ব্লকের সঙ্গে যোগ দিতে পারে।

পার্লামেন্টের আগামী সাধারণ নির্বাচনে এন ডি এ-র এই পাঁচটি দলকে ভীষণভাবে প্রচার করতে হবে। তাদের কর্মসূচী হবে— জাতীয় ঐক্য দৃঢ় করার জন্য দুর্নীতি দূর করা এবং হিন্দুত্ববাদকে সমর্থন দেওয়া। অন্যায়ভাবে খুশী করা নয়, স্বচ্ছতা, সহযোগিতা ও নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মুসলিম ও খৃস্টান ভোটারদের এন ডি এ-র পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা যায় তাহলে লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত। সংখ্যালঘুরা এই অবস্থায় তখন এন ডি এ-তে যোগ দেবে।

(সৌজন্যে : অর্গানাইজার)

নেত্রদান মহাদান

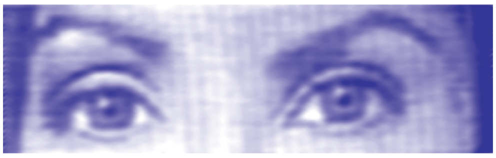

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

PIONEER®

নিখুঁত লেখার খাতা

প্রতি পৃষ্ঠায় PAGE NO. DATE এর ঘর।
পাইওনিয়ার পূর্ব ভারতের সর্বাধিক বিক্রিত খাতা।
আদর্শ বাঁধাই ও সুন্দর সাইজ।
ভাল হাতের লেখার জন্য মসৃণ Creamwove & D.T.P.P. কাগজ ব্যবহার করা হয়।
প্রতিটি খাতায় সঠিক মার্জিন এবং লাইনিং। সর্বোত্তম গুণমান ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরী।
ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড নির্দেশিত IS: 5195-1969 নির্দেশিকা কঠোর ভাবে পালন করার প্রয়াস।
প্রতি পৃষ্ঠায় Teacher's Signature.................... কলাম।

PIONEER PAPER CO.
Off: 4a, Jackson Lane(1st floor)
Kolkata-1. Ph:350-4152, 353-0556
Fax:91-33-353-2596.
E-Mail:pioneer3@vsnl.net

PIONEER®
সঠিক গুণমানই আমাদের পরিচয়

মনমোহন সিং কি পারবেন ভ্রষ্টাচারীরাজ বাঁচাতে?

দেবব্রত চৌধুরী

ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ "নৈশ ভোজের রাজনীতি" চালিয়ে লোকসভার আগামী শীতকালীন অধিবেশনে ইউ.পি.এ সরকার ২-কে বাঁচাতে মরিয়া চেষ্টা শুরু করেছেন। কিন্তু বাঁচবে কি? বর্তমান পরিস্থিতি যা তাতে গোটা দেশেই কংগ্রেস বিরোধিতার একটা আবহাওয়া তৈরি হয়েছে। এবার কংগ্রেস বিরোধিতা বোফোর্স কেলেঙ্কারিকেও ছাপিয়ে গেছে।

কংগ্রেসের আঁতুড়ঘরে জন্ম নেওয়া তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১৭ সেপ্টেম্বর দীপ্তকণ্ঠে বলেন, "এই সরকারের (ইউ পি এ-২) আর একদিনও

কালমাদি

এ রাজা

ক্ষমতায় থাকা উচিত নয়। এটা একটা লুঠেরা সরকার। জনবিরোধী এই সরকারকে আমরা বোল্ড আউট করবো। সংসদের অধিবেশনের প্রথম দিনেই তৃণমূল অনাস্থা প্রস্তাব আনবো"। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাছে আবেদন রেখেছেন তাঁরা যেন অনাস্থা প্রস্তাব সমর্থন করেন। তিনি এও বলেছেন যে এই প্রস্তাবের মধ্যেই জানা যাবে কোন দল দুর্নীতির পক্ষে আর কারা বিপক্ষে। কারণ দেশবাসী এখন ইউপিএ-২ এর চরম বিপক্ষে।

প্রথমেই ধরা যাক খুচরো ব্যবসায় বিদেশী বিনিয়োগ (এফ ডি আই)। ভারতে খুচরো বিপণন মানে বছরে ৪৫০০০ কোটি ডলারের ব্যবসা আর এতে নিযুক্ত আছে ৪ কোটি ৪০ লক্ষ মানুষ। কি আশ্চর্য ওয়াল-মার্টের বার্ষিক লেনদেনের পরিমাণ প্রায় একই --- ৪৪০০০ ডলার। অথচ কর্মীসংখ্যা সাকুল্যে ২১ লক্ষ। কোথায় ৪ কোটি ৪০ লক্ষ আর কোথায় ২১ লক্ষ। পশ্চিমবঙ্গের চিত্র কিন্তু আরও ভয়াবহ। এরাজ্যে শ্রমজীবীর সংখ্যা প্রায় ৪ কোটির উপর। এর ৮৯ শতাংশ অসংগঠিত শিল্প ও খুচরো বিপণনের উপর নির্ভরশীল। আর সামান্য শ্রমশক্তি নিয়ে ওয়ালমার্ট যদি লেনদেনের এই বিপুল অঙ্ককে ছুঁতে পারে তবে আমরা কীভাবে আশা করতে পারি বৃহৎ রিটেল সংস্থা কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে? একটি ওয়ালমার্ট আর আমাদের একটি ছোট দোকানের গড়পড়তা লেনদেনের তুলনা করলে দেখা যাবে সংস্থার একটি নূতন কর্মসংস্থান মানে আসলে ১৭ জন বেকার। সোজা অঙ্ক— একটি ওয়ালমার্টের সুপার মার্কেট মানে ১৩০০ ছোট-মাঝারি দোকানের ঝাঁপ বন্ধ। ৩৯০০ জন বেকার শ্রমজীবী মানুষের ভবিষ্যত অন্ধকার, অনিশ্চিত ভবিষ্যত।

দেশের একদিকে ইউপিএ সরকার আর অন্যদিকে কিছু বেইমান ৫০০ লক্ষ কোটি টাকা লুঠ করেছে। গত ১০ বছরে প্রায় এক লক্ষ চাষী আত্মহত্যা করেছে। প্রতি বছরে ২০ হাজার চাষীর আত্মহত্যা— প্রতিদিন ৫৬ জন অর্থাৎ প্রতি ঘণ্টায় ২ জন কৃষক আর্থিক অনটনের জন্য আত্মহত্যা করেছে (ন্যাশনাল ক্রাইম ব্যুরোর রিপোর্ট অনুসারে)।

ভর্তুকির বায়না তুলে মনমোহন সরকার রাতারাতি গ্যাস-পেট্রল-ডিজেলের দাম বাড়িয়ে দিল। অথচ আমাদের দেশের ৩টি তেল সংস্থা আই ও এল, এইচ পি সি এন এবং বি পি সি এল যে ব্যালান্স সীট পেশ করছে তাতে বিপুল লাভ দেখানো হয়েছে। তা নিম্নে দেওয়া হলো—

২০১০-১১	২০০৯-১০	২০০৮-২০০৯	২০০৭-২০০৮
	লাভ কোটির অঙ্কে		
১০৫৩১.১৭	১৩০৫৯.৫৪	৪২৬০.৪৩	৯৬৭৮.০২

আবার তিনটি সংস্থাই যখন একই ব্যবসা করে তখন তিনটি সংস্থা এক সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয় না কেন— কার স্বার্থে? মিলিয়ে দিলে অনেক কোটি বাঁচানো যায়। উদাহরণ—

বোর্ড মেম্বার আছে ১৮ জন— হতে পারে ১০ জন।

এক্সিকিউটিভ অফিসার ১৪৬৪৪— হতে পারে ২৯০৯ জন।

শ্রমিক আছে— ১৯৭০৯— হতে পারে ৪৪২৫ জন।

এই পদ্ধতিগ্রহণ করলে এই মুহূর্তে খরচ কমবে ১০,০০০ কোটি টাকা। প্রতিবেশী বাংলাদেশ-নেপাল-পাকিস্তান ভারত থেকে যথাক্রমে প্রায় ৪৫ শতাংশ, ৪৮ শতাংশ এবং ৪৩ শতাংশ কম দামে পেট্রোল গ্যাস বিক্রি করে কিভাবে?

এরপর আছে একগুচ্ছ আর্থিক কেলেঙ্কারি। কমনওয়েলথ গেমস আর্থিক অনিয়মের জন্য ধরা পড়া কালমদীজীকে আবার পুনর্বাসন

দেওয়া হয়েছে। ২-জি স্পেকট্রাম কেলেঙ্কারিতে দেশের ১ কোটি ৭৬ হাজার কোটি ও কয়লা কেলেঙ্কারিতে ১.৮০ কোটি এবং দিল্লী এয়ারপোর্ট-এ ১৬৩০০০ হাজার কোটি টাকা ও Ulta Mega Power

Project-এ ২৯ হাজার টাকার লোকসান হয়েছে। মনমোহন সিংকে 'Secanking' আর ইউ পি এ সরকারের রাজত্বকে "কেলেঙ্কারিরাজ" নামে ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হতে চলেছে। কারণ এইসব কেলেঙ্কারি ক্যাগ-এর রিপোর্ট প্রকাশ পেয়েছে। দেশের সব দল ইউপিএ সরকারের কাছে বিদেশে গচ্ছিত 'কালোটাকা' ফিরিয়ে আনার জন্য দাবি জানিয়েছে। কিন্তু মনমোহন সরকার কানে দিয়েছেন তুলো, যতই চান,—স্পিকটি নট। এই কালো টাকার পরিমাণ প্রায় ৫০০ লক্ষ কোটি টাকা। দেশের একদিকে ইউপিএ সরকার আর অন্যদিকে কিছু বেইমান ৫০০ লক্ষ কোটি টাকা লুঠ করেছে। গত ১০ বছরে প্রায় এক লক্ষ চাষী আত্মহত্যা করেছে। প্রতি বছরে ২০ হাজার চাষীর আত্মহত্যা—প্রতিদিন ৫৬ জন অর্থাৎ প্রতি ঘণ্টায় ২ জন কৃষক আর্থিক অনটনের জন্য আত্মহত্যা করেছে (ন্যাশনাল ক্রাইম ব্যুরোর রিপোর্ট অনুসারে)। এই টাকা ফেরত এলে আমেরিকা, ইংল্যান্ড, চীন ও জাপানের থেকে ভারত শক্তিশালী হতে পারে।

আজ ভারতের কালো টাকায় আমেরিকা, ইংল্যান্ড বিলাসিতা করছে অথচ ভারত আর্থিক অনটনে ভুগছে কেন? মনমোহন সরকারের জন্য আমাদের অর্থ ও শক্তি অন্য দেশে কাজে লাগছে আর আমরা দুর্বল হচ্ছি।

মূল্যবৃদ্ধি লাগাম ছাড়া। এন ডি এ সরকার সুদ ও পেট্রোলের দাম বাড়িয়ে ছিল। কিন্তু জনগণ যাতে বিপর্যস্ত না হয় তার জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বিশেষ বাড়তে দেওয়া হয়নি। (নীচের চিত্র দেখুন)।

২০০৪ সালে মে মাসে এন ডি এ সরকার বিদায়ের সময় দাম ছিল—

চাল—	১০ টাকা	প্রতি কেজি
চিনি—	১৪ টাকা	"
চা—	৮০ টাকা	"
মুগডাল—	২৪ টাকা	"
পেঁয়াজ—	৬ টাকা	"
দুধ—	১৪ টাকা	"
পেট্রোল—	৩৩.১৫ টাকা	"
ডিজেল—	২২.৫০ টাকা	"

আজ কি দাম তা জনগণ বিচার করুক। মমতার অনাস্থা প্রস্তাবকে বিজেপি যে সমর্থন করতে প্রস্তুত তা লালকৃষ্ণ আদবানী জানিয়েও দিয়েছেন। কিন্তু অন্য সব দল রা-রা করে উঠেছে— বিজেপি সাম্প্রদায়িক দল। তার সমর্থন নেওয়া উচিত হবে না। কারণ 'গোধরা' কি ভোলা যায়? কিন্তু বলছে না ২০০২ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি আগে ১৯৪৭ সাল থেকে ৫৫ বছর ওই স্থানে ছোট বড় ১৬টি সংঘর্ষ ও দাঙ্গা হয়েছিল। কেন? কংগ্রেস আমলে ওখানে ২ বার কার্ফু জারি করা হয়েছিল কেন? অথচ মাইনরিটি কমিশনের চেয়ারম্যান ডঃ আসগর আলি ইঞ্জিনীয়ার তাঁর রিপোর্টে লিখেছেন ১৯৯৯-২০০৩ মহারাষ্ট্রে ৮৭টি দাঙ্গা হয়েছে, ৩৩১টি খুন হয়েছে, ১০০ কোটি টাকা লোকসান হয়েছে। ঘটনাগুলি ঘটেছে বেশিরভাগ ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাতিলের এলাকায়। এর জন্য শিবরাজ পাতিল লোকসভার ভোটে পরাস্তও হন। এখানেই শেষ নয়, ডঃ আসগর আলি ইঞ্জিনীয়ার তার সম্পাদিত 'Seculer Prespective'-এ ১-১৫ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় (২০১২) লিখেছেন— রাজস্থানে কংগ্রেস রাজত্বে সম্প্রতি সারদা, মঙ্গলথানা ও গোপালগড়ে বড়সড় দাঙ্গা হয়ে গেছে। তিনি পরিষ্কারভাবে লিখেছেন গোপালগড়ে একটি মসজিদে ঢুকে রাজস্থান পুলিশ ১০ জন মুসলিমকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করেছে। এতদ্‌সত্ত্বেও কংগ্রেস, বামফ্রন্ট তৃণমূল কংগ্রেস হলো সেকুলার আর ভারতীয় জনতাপার্টি সাম্প্রদায়িক— এইসব আওয়াজ তুলে বিজেপি-কে কতদিন ক্ষমতার বাইরে রাখবেন? আর হয়তো পারবেন না।

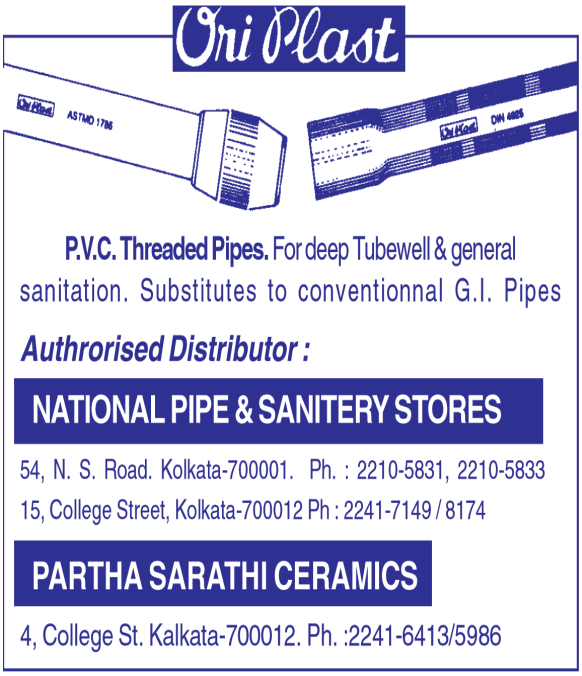

চিঠিপত্র

গৃহকর্ত্রীদের মাস মাইনে

সম্প্রতি সংবাদে প্রকাশ গৃহকর্ত্রীদের, স্বামীর রোজগারের অর্থ থেকে কিছু অংশ স্ত্রীদের মাসমাইনে হিসাবে দিতে হবে।

ভারতীয় সমাজে (হিন্দু সমাজ) বিবাহ একটি পবিত্র সম্পর্ক। এঁদের সম্পর্ক আমৃত্যু বজায় থাকে। পাশ্চাত্যের মত ঘনঘন স্বামী বা স্ত্রী বদল করা হয় না। নববধূ ক্রমে গৃহিণী সন্তানের মা হয়ে ওঠেন। এবং একজন সুগৃহিণী বা গৃহলক্ষ্মী রূপে পুরো সংসারটি পরিচালনা করেন সুচারু রূপে। এভাবেই গড়ে উঠেছে ভারতীয় সামাজিক ব্যবস্থা। কখনও কোথাও ব্যতিক্রম ঘটে না সেটা বলা যাবে না। তবে সেটা 'সিন্ধুতে বিন্দু মাত্র'।

সরকার চিন্তাভাবনা করছেন গৃহকর্ত্রীদের পারিশ্রমিক বাবদ স্বামীর রোজগার থেকে কিছু অংশ বাধ্যতামূলকভাবে স্ত্রীদের দিতে হবে। ঘর সামলানোর জন্য। একজন পুরুষ বা স্বামীর মাসিক যা রোজগার হয় তাই দিয়ে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ও পরিবারের অন্য সদস্যদের নিয়ে সংসার পরিচালনা করেন। তাহলে, স্ত্রীদের আলাদাভাবে অর্থ দেওয়ার প্রয়োজন কোথায়? সংসারের যাবতীয় প্রয়োজন যখন সেই ব্যক্তি বা স্বামী বহন করছেন। স্বামীর আয়ের অর্থ থেকে কিছু অংশ যদি স্ত্রীদের দেওয়া হয়, তবে, ভবিষ্যতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে ফাটল ধরবে। 'অর্থই অনর্থের মূল' কারণ। স্ত্রীরা তখন দাবি করতেই পারেন যে পরিমাণ অর্থ আমায় দেওয়া হচ্ছে তার দ্বারা খরচ কুলানো যাচ্ছে না, আরও বেশি টাকা দিতে হবে। ওই পরিমাণ টাকার উপর ইনক্রিমেন্ট ডি এ দিতে হবে। সপ্তাহে একদিন ছুটি দিতে হবে। ওইদিন সংসারের যাবতীয় কাজ তোমরা করবে। বছরে একবার বাড়ির বাইরে বেড়াতে নিয়ে যেতে হবে, যেহেতু তোমরা ভ্রমণ-ভাতা পেয়ে থাক। মাসের অর্ধেক দিন সন্তানদের পুরো দায়িত্ব নিতে হবে।

আমাদের দেশের বেশির ভাগ নেতা-নেত্রী পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, পাশ্চাত্যভাব ধারায় ভাবিত হয়ে এধরনের আইন প্রণয়নের চিন্তা করছেন। সরকার এবং এন জি ও-গুলির উচিত হবে মহিলাদের স্বনির্ভর করা যাতে স্ত্রীরা গৃহকাজ করেও গৃহে বসেই কিছু আয় করতে পারে, সে বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করা। এ ধরনের চিন্তা-ভাবনাকে আইনে পরিণত করার পূর্বে গভীরভাবে ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে।

—**অনিলচন্দ্র দেবশর্মা, দেবীবাড়ি, নতুনপাড়া, কোচবিহার।**

দাঙ্গা রুখতে

ভারতীয় সংসদীয় গণতন্ত্রের গতিপ্রকৃতি দিন দিন যেভাবে অবক্ষয়ের পথে অগ্রসর হচ্ছে তাতে ভবিষ্যতের একটি ছবি বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠিতেছে। স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী ধূর্ত ও কায়েমী স্বার্থের অধিকারী দেশনেতা দেশের অশিক্ষিত জনগণকে বিভিন্ন সময় নানারূপ ভুল বুঝিয়ে এতদিন বহালতবিয়তে দেশ শাসন করে আসছিল। শিক্ষার প্রসার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন দেশবাসী তাদের স্বরূপ বুঝতে পারছে তখনই তারা সাম্প্রদায়িক, সংখ্যালঘু ইত্যাদি প্রশ্ন তুলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে শুধুমাত্র সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ক কব্জা করার জন্য। আর এই কথাটাই যখন দেশবাসী বেশ বুঝতে পারছে তখনই তাদের নাভিশ্বাস উঠেছে।

এরা শুধুমাত্র নিজেদের ও দলের স্বার্থের কথাই সর্বদা চিন্তা করছে। এতে যে দেশের ভবিষ্যতে কি ক্ষতি হতে পারে— সে দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। আর তার ফলে সম্প্রতিকালে অসমে জাতি দাঙ্গা জন্ম নিয়েছে। তাই শুধু অসমেই নয়, আগামীদিনে এই জাতি দাঙ্গা যে সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু অধ্যুষিত ভারতের প্রায় সকল রাজ্যেই ছড়িয়ে পড়বে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কারণ এখনও পর্যন্ত ভারতে যারা সংখ্যালঘু আছে তারাও বিশেষ মৌলবাদীদের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়ে ও সরকারি মদতপুষ্ট হয়ে যেভাবে দেশের সংখ্যাগুরুদের ওপর ক্রমশ প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা চালাচ্ছে অসমের জাতিদাঙ্গা তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। অতএব এখনও যদি ঐক্যবদ্ধভাবে এই প্রবাহের গতিরোধ করতে না পারা যায় তবে দেশের ভবিষ্যত যে খুবই দুর্ভাগ্যজনক তা বলা বাহুল্য মাত্র।

—**পাঁচুগোপাল ঘোষ, নরেন্দ্রপুর, হাওড়া।**

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী
নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।
শান্তিনিকেতন, বোলপুর
ফোন - (০৩৪৬৩) ৫৬২২২

অতঃ কিম

ভাস্কর ভট্টাচার্য

আমাদের এই ভারতবর্ষ হাজার হাজার বছরের প্রাচীন ঐতিহ্যের ওপর দাঁড়িয়ে। বিভিন্ন ঋষি মহাঋষি তাঁদের আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ করে গেছেন, যা আমাদের পূর্বসূরীগণ বহন করে এসেছেন এবং পরবর্তী প্রজন্মকে দান করে গেছেন সেই শিক্ষা যা সত্যিকারের মানুষ গঠনের জন্য উপযোগী। আমাদের এই মহান দেশেই রচিত হয়েছে রামায়ণ, মহাভারত যা শুধু গল্পের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এইগুলি অসীম জ্ঞানের ভাণ্ডার।

এই মহাকাব্যকে বিশ্লেষণ করলে আমরা সঠিক দিশা পাই সামাজিক অবস্থানের। এই গ্রন্থে রাজ্য শাসনের জন্য যেমন রাজাকে শিক্ষা দান করা হয় মহৎ প্রশাসক হওয়ার, তেমনি প্রজাকে দিক্ নির্দেশ দেয় অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া ও রাজকার্যকে সহায়তা করে এক উচ্চতর সমাজ গঠন করা যার ফল সেই প্রজাই ভোগ করে।

ধর্ম কি, তার প্রভাব মানুষের মধ্যে কতটা প্রয়োজন ও অনিবার্য তা দেখিয়ে গেছেন শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ। শৌর্যে, বীর্যে বলবান হলে তবেই যে শত্রুকে ঠেকানো বা পরাজিত করা সম্ভব তা দেখিয়ে গিয়েছেন সুভাষচন্দ্র বসু, নজরুল ইসলাম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভগৎ সিং, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকি, মাতঙ্গিনী হাজরা, শহীদ গোপীনাথ-এর মত অসংখ্য দেশ ভক্ত।

আমরা দেখেছি সেই সময় বা তারও আগে ছিল রাজনীতি, ছিল নিজস্ব সমাজনীতি। মানুষ তখন এত বেশি স্বার্থপর ছিল না। ছিল না শুধু নিজের জন্য চিন্তা করা।

এখন বিশ্বায়নের যুগ। আমরা এগিয়ে চলেছি। আগে ছিল গোরুর গাড়ি, পরে এলো মোটর গাড়ি, তারপর হাওয়াই জাহাজ, রকেট, এখন আমরা চলে যাচ্ছি পৃথিবী ছাড়িয়ে অন্য গ্রহে।

আগে ছিল পোস্টকার্ড সংবাদ আদান প্রদানের মাধ্যম, এখন ইন্টারনেটের যুগে, মোবাইল ফোন, আইপড, আইপ্যাড, কম্পিউটার এবং এগুলোর আবার অত্যাধুনিক ভার্সান। উন্নতি করেই চলেছি। যুদ্ধ এখন আর অন্য দেশে গিয়ে শারীরিক বল প্রয়োগ করে করার প্রয়োজন নেই। একটা ঘরে বসে আধুনিক কম্পিউটারের মাধ্যমে একটা বোতাম টিপলেই, একটি মারণ ক্ষেপণাস্ত্র অন্য দেশে গিয়ে তার লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করে সেই দেশের ধ্বংসলীলা রচনা করবে।

আমরা কি ভেবে দেখেছি যে আমাদের এই উন্নতি, অগ্রগতি সবই বাহ্যিক? আমরা ভেতরে ভেতরে ফাঁপা, শেষ করে ফেলেছি নিজেদের, নিজের পরিবারকে, নিজের সমাজকে,নিজের দেশকে। আগে আমাদের মধ্যে সত্যিকারের মানুষের গুণগুলো, বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্যমান ছিল। ছিল সহনশীলতা, অধ্যবসায়, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যের প্রতি প্রেম, ভালবাসা, সমাজ সংসারের প্রতি দায়বদ্ধতা, একে অন্যের দুঃখে কাতর হওয়া, একে অন্যের পাশে এসে দাঁড়ানো। সহযোগিতার মনোভাব ছিল আগে, যখন আমরা এই বিজ্ঞাপনের যাঁতাকলে পড়িনি। সত্যিকারের শিক্ষিত ছিল মানুষ। ছিল মায়া, মমতা, সততা। ছিল আত্মমর্যাদা, ছিল হুঁশ অর্থাৎ সচেতনতা। ছিল শিক্ষক ছাত্রের এক মধুর সম্পর্ক, যেখানে শিক্ষকের শাসন মাথা পেতে নেওয়াই ছিল শিক্ষা।

আজ আমরা আমাদের বাইরেটাকে সাজাতে গিয়ে নিজেদের ভেতরের সেই সব অমূল্য সম্পদগুলো নষ্ট করে ফেলেছি। আমরা বাইরে যত উন্নত হচ্ছি, ভেতরের অবনতি ততই ধরা পড়ছে আমাদের সর্বস্তরে। এখন শ্রদ্ধা ভক্তি করাটা যুব সমাজের কাছে হাস্যকর। বরঞ্চ নিজের অধিকার সম্পর্কে আমরা সবাই সচেতন। আমাদেরও দায়িত্ব আছে, কর্তব্য আছে। সেগুলো পালন করলেই আমাদের অধিকার এমনিই গ্রহণযোগ্য হবে, এই বোধশক্তি আজ আমরা হারিয়েছি।

আমাদের মধ্যে আজ দেশাত্মবোধের চরম অভাব। যার জন্য আমরা নিজের নিজের সন্তান-সন্ততিকে সঠিক শিক্ষা দিতে পারছি না। শুধু পাঠ্যপুস্তকের শিক্ষা আসল শিক্ষা নয়। সেই শিক্ষা তাকে তাড়া করে বেড়ায় কি ভাবে অন্যের ঘাড়ে উঠে, অন্যকে বঞ্চিত করে অন্যকে অবজ্ঞা করে নিজের কেরিয়ার প্রতিষ্ঠিত করা যায়। তার ফলে সেই যুবক বা যুবতী দেখে না কখন সে নিজেকে দেশের বাইরে, সমাজের বাইরে আবার অনেক সময় নিজের সংসার, আত্মীয় পরিজন, বন্ধু-বান্ধবের বাইরে করে ফেলেছে। তখন তাদের পাশে কেউ নেই। সে নিঃসঙ্গ। নেই তার সেই নিঃস্বার্থ স্বত্ত্বা, নেই তার আত্মমর্যাদা, নেই তার সহানুভূতির ছোঁয়া। সে এক যন্ত্রে পরিণত হয়েছে।

তাদের দ্বারা তৈরি আগামী সমাজ তো যান্ত্রিকই হবে। সেখানে কোনও অন্তরের অনুশাসন থাকবে না। একে অন্যকে ডিঙিয়ে গিয়ে সব কিছু পাবার তাড়নায় ছুটবে, যে রকম বন্য মানুষ ছিল। যার কাছে ক্ষমতা ছিল, খাদ্য ছিল তারই। এই অসম যুদ্ধ থেকে দুর্বলকে রক্ষা করার জন্যই তো এই সমাজ সংসার এর জন্ম।

আমরা কি আবার সেই অসভ্য যুগের বার্তাকে বয়ে নিয়ে আসছি না? আমাদের ভাবতে হবে।

আমার মনে হয় আমাদের সবাইকে এখন ভাবতে হবে আমাদের সমাজ আমাদের দেশ কিভাবে চললে, সমগ্র পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণাধীন হতে পারে। একদিকে ফিরিয়ে আনতে হবে আমাদের প্রাচ্যের হারিয়ে যাওয়া বুনিয়াদী শিক্ষা যা আমাদের উত্তরসূরীদের দেবে নৈতিকতা, মূল্যবোধ। আর বিজ্ঞানের সহায়তার সীমানাকে নিরূপণ করার প্রচেষ্টা, যা রক্ষা করবে প্রকৃতিকে ধ্বংসের হাত থেকে।

একটি প্রার্থনার গান অন্যভাবে শোনা

অন্যদিনের মতো সেদিনও দরজা খোলা ছিল। পর্দা ঝুলছে। বেশিরভাগ দিন পর্দাটা সরানো থাকে। ঘরের একদিকে বসে গান করছিলেন তিনি,যাঁর ঘর। সামনে বসে বেহালা বাজাচ্ছেন একজন। পিছন ফিরে বসায় চেনা যাচ্ছে না। গায়কের সবসময়ের কাজের লোক বললেন ইশারা করে অরুণকে, 'কোনও শব্দ কোর না।'

দুজনে গানের মধ্যে যেন ভেসে চলেছেন। দরাজগলায় চোখ বুজে গায়ক গাইছেন। যিনি বেহালা বাজাচ্ছেন তিনি মাঝে মাঝে চোখ মুছছেন। একই গান ফিরে ফিরে গেয়ে চলেছেন। সুরে ভুল নেই, উচ্চারণে ভুল নেই। গায়ক ঢুকে পড়েছেন গানের গভীরে। হারমোনিয়ামের রিডের ওপরে আঙুল চলছে স্বচ্ছন্দে। মনে হলো গানটা বিশেষ অনুরোধে শোনাতে গিয়ে দুজনেই নিবিষ্ট হয়ে পড়েছেন। এসময় ধ্যানমগ্ন দুটি মানুষকে একমনে লক্ষ্য করল অরুণ চুপচাপ বসে।

রবীন্দ্রনাথ গানটি যখন লিখেছিলেন তখন তাঁর বয়স ৫৩ বছর। চৈত্রের শেষ দিকে গানটা এসেছিল মনে। লিখে রাখতে দেরি করেননি গীতিকার। মনে মনে সুর এসে গিয়েছিল। সুর হারিয়ে যাওয়ার আগে কাউকে ধরিয়ে দিলেন। স্বরলিপি তৈরি। গানের কথাগুলোয় কোনও ফাঁক নেই। ভাবনাকে একেবারে অন্যভাবে ধরা।

অরুণ শুনতে লাগল গান। অন্যদিন তো এভাবে শোনার সুযোগ হয় না। কোথাও অন্য কোনও শব্দ নেই গান ছাড়া। গানের কথাগুলো যেন ছবি হয়ে উঠতে লাগল অরুণের মনে।

'আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে দেখতে আমি পাইনি।/ তোমায় দেখতে আমি পাইনি।/ বাহির-পানে চোখ মেলেছি, আমার হৃদয়-পানে চাইনি।' অরুণ মনে মনে গাইছিল। এতো একান্ত ভক্তির নিবেদন। ভাবনা একজনের। তা অন্যভাবে মন ভরিয়ে দিচ্ছে অন্যদের।

গান চলছিল, 'আমার সকল ভালোবাসায় সকল আঘাত সকল আশায়/ তুমি ছিলে আমার কাছে, তোমার কাছে যাইনি।' এতো গভীর সত্য। বার বার এমন হয়েছে। কিন্তু কখনও তো ওইভাবে নতজানু হয়ে স্বীকার করা সম্ভব হয়নি। গান শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল অরুণের ভিতরে কে যেন নাড়া দিচ্ছে।

গান শুনতে শুনতে অরুণ ভাবছে। গানের পরের অংশও মনে মনে গাইল, 'তুমি মোর আনন্দ হয়ে ছিলে আমার খেলায়—/ আনন্দে তাই ভুলেছিলেম, কেটেছে দিন হেলায়।' এবার দেখল পিছন ফিরে যিনি বেহালা বাজাচ্ছেন তিনি চোখ মুছছেন। এমন গানের কথা যা শুনতে শুনতে কাঁদতে হয়। অরুণ ছোটবেলায় কীর্তনের আসরে গেছে কয়েকবার বাড়ির কারও সঙ্গে। দেখেছে, অনেকেই কাঁদছে। গান হয়তো ওইভাবেই মর্মে প্রবেশ করে আকুলতা জাগায়। হয়ে ওঠে সমবেত নিবেদন। এই গানও সেরকম রূপ নিয়েছে।

গানের শেষ অংশটা গাওয়া হচ্ছিল, 'গোপন রহি গভীর প্রাণে আমার দুঃখসুখের গানে/ সুর দিয়েছ তুমি, আমি তোমার গান তো গাইনি।' অরুণের মনে হচ্ছিল একথা তো তারও। গানের কথাগুলো কোনও সময়সীমায় ধরা নেই। কোনও গণ্ডিতে আটকে নেই। চিরকালের সত্য মঙ্গল রূপ। একান্ত প্রার্থনার সময় সকলের মনের আকুতি। গানটা অনেকবার শুনেছে। কিন্তু সেসব শোনার সঙ্গে এই দিনের শোনার কোনও মিল নেই। এই শোনা যেন জীবনের মূল্যবান স্মৃতি-সঞ্চয়।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর অনেক পরে অরুণের জন্ম। গানটা লেখার পর আরও ২৭ বছর পরে তাঁর জীবনাবসান। কতরকম সৃষ্টি করেছেন। ওই গানটি হঠাৎ একদিন মনে ধরা দিয়েছিল সুর নিয়ে। কোনও সময় অদলবদল করতে চাননি গানটির কথা বা সুর। উত্তরকালের মানুষ একেকরকমভাবে শুনবে।

একসময় গান থামল। গায়ক উঠে দাঁড়ালেন। বেহালা রেখে উঠে দাঁড়ালেন বাদক। বিখ্যাত মানুষ তিনি। মনে হলো তাঁকে শোনাবার জন্যেই এভাবে গাওয়া, গানের ভিতর দিয়ে যাওয়া। একটিই গান অনেকক্ষণ ধরে এতবড় গায়কের ঘরে শোনার অভিজ্ঞতা ক'জনের আর হয়!

অরুণ দেখল, গায়ক তার বাদক পরস্পরকে গভীর আলিঙ্গনের মাধ্যমে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। গানে গানে যে নিবেদন তা যেন গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজোই। রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম জানানোর সঙ্গে নতজানু প্রার্থনা তো ঈশ্বরের কাছেই। অরুণ দুজনকেই প্রণাম করল।

গায়ক বললেন 'প্রণাম করো ওই মানুষটিকে।' দেখিয়ে দিলেন রবীন্দ্রনাথের ছবিটা।

প্রাচীন ভারতের বিমান ও তার চর্চা

পরম্পরা

নীতিন রায়

ইংরেজরা চলে গেছে। কিন্তু সেকালের শিক্ষা পদ্ধতি আমরা অনুসরণ করে চলেছি। এরপর কম্যুনিস্টদের অসামান্য তৎপরতায় আমরা নিজেদের ভুলে গিয়ে পাশ্চাত্যমুখী হয়েছি। নিজেদের দিকে ফিরে তাকাবার সময় নেই। তাই ভারতীয় হয়েও সংস্কৃত শিখিনি। যিনি বিজ্ঞান জানেন তিনি সংস্কৃত জানেন না। আবার যিনি সংস্কৃত জানেন তিনি বিজ্ঞান জানেন না। তাই প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান-চর্চা সম্পর্কে জানি না। যদিও বা জানি তবে না জানার ভান করে থাকি। পুঁথিগুলো অনাদরে পোকায় খাচ্ছে, না হয় বিদেশীরা হাতিয়ে নিচ্ছে।

প্রাচীন হিন্দু ভারতের আকাশে বিমান উড়তো। তিন প্রকারের বিমান ওড়ার বর্ণনা পাওয়া যায়। যথা— (১) স্থানীয় ভাবে (২) একদেশ হতে অন্য দেশে এবং (৩) একগ্রহ থেকে অন্য গ্রহে। এখানে কিছু কাহিনী সংক্ষিপ্ত ভাবে উল্লেখ করব। কর্দম মুনি কপিল মুনির বাবা। কর্দম মুনির স্ত্রী ছিলেন দেবাহুতি। তিনি স্বয়ম্ভু মনুর কন্যা। রাজকন্যা দেবাহুতির জীবন মুনির পর্ণকুটীরে অশেষ কষ্টেই কাটছিল। কর্দমমুনি এই কষ্ট দূর করার জন্য রাজপ্রাসাদ সহ একটি অন্তরীক্ষযান বানিয়ে দেন। এই অন্তরীক্ষযান নিয়ে দেবাহুতি এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে ঘুরে বেড়াতেন।

আরেকটির বর্ণনা মহাভারতে রয়েছে। মহারাজ শাল্ব ছিলেন সৌভরাজ্যের রাজা। তার বিমানটির নাম ছিল 'সৌভনগর'। সৌভনগরের সাহায্যে শাল্ব বৃষ্ণিদের রাজ্য আক্রমণ করেন। শিশুপালকে হত্যার জন্য তিনি শ্রীকৃষ্ণের উপর ক্ষুব্ধ ছিলেন। শাল্ব আকাশ পথে সৌভনগর নিয়ে ব্যূহ রচনা করেন। তাই মনে হয় সৌভনগর ছিল 'ফ্লিট'। সৌভনগরের সাহায্যে লৌহ গোলক নিক্ষেপ করে তিনি বৃষ্ণিদের তিনটি নগর ধ্বংস করেন। যা করে থাকে আজকের বোমারু বিমান। ভয়ঙ্কর যুদ্ধে বৃষ্ণিগণ এঁটে উঠতে অসমর্থ হন। শাম্ব ও প্রদ্যুম্ন যুদ্ধেক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন সুর্দশন চক্র দ্বারা সৌভনগরকে মাঝখান দিয়ে ছেদন করেন। সৌভনগর ভূতলে পতিত হয়। শাল্ব যুদ্ধে নিহত হন।

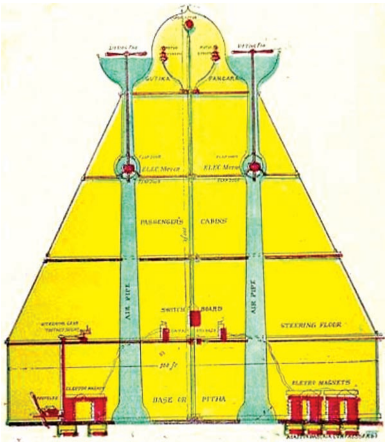

রুক্মা বিমান

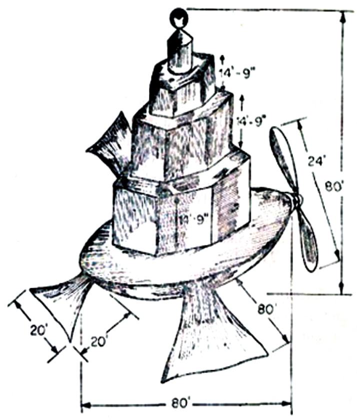

সকুনা বিমান

আবার দেখুন দেবরাজ ইন্দ্রের রথের বর্ণনা প্রায় আধুনিক বিমানের মতো। কাশীদাসী মহাভারতে রয়েছে তার বর্ণনা। এই বর্ণনা রাজশেখর বসুর মহাভারতেও রয়েছে— "বায়ুবেগ গতি দশ সহস্র তুরঙ্গসম সেই দৃষ্টি বিলোভেন মায়াময় রথ বহন করিতেছে। তাহার প্রচণ্ডবেগে জলদমালা ছিন্নভিন্ন হওয়াতে নভোমণ্ডল নির্মল হইল এবং ঘনঘটার গভীর গর্জনসদৃশ নির্ঘোষে দিক সকল প্রতি ধ্বনিত হইতে লাগিল। তন্মধ্যে অসি শক্তি গদা প্রাস, বিদ্যুৎ ও বজ্র প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র সকল এবং মহাকায় জ্বলিতানন অতি ভীষণকায় নাগপাশ ও ধবলোপন সমূহ দেদীপ্যমান রহিয়াছে দেখিলেন।...ধীমান কুরুনন্দন সেই সূর্যশঙ্কাশ দিব্যরথে নীত হইয়া আকাশ পথে গমন করিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে মর্ত্যলোকদিগের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়া অদ্ভুতরূপ সহস্র সহস্র বিমান সন্দর্শন করিতে লাগিলেন।"

মাতালি অর্জুনকে নিয়ে যখন অমরাবতী যাচ্ছিলেন তখন আকাশ পথে এক আকাশচর কৃত্রিম নগর দেখতে পান। পথে এই বৈমানিক নগরে অট্টালিকা, গাছগাছালি, পক্ষী প্রণীতে সুশোভিত ছিল। ধ্বংস করার কাহিনী অর্জুনের মুখেই শুনুন— "অনন্তর আমি বিবিধ আয়ুধপোত দ্বারা দনুজদলসহ সেই দেদীপ্যমান কামচারী নগরী আক্রমণ করিলাম; ওই দিব্যপুরী কখনও ভূতলে নিপতিত, কখনও ঊর্ধ্বে উৎপতিত, কখনও তির্যকভাবে বিচলিত, কখন বা সলিলে নিমগ্ন হইতে লাগিল। ...এদিকে বৈমানিক নগর ও দানবগণ নিমজ্জিত হইলে দানব রমণীরা নিতান্ত দুঃখিনী ও স্খলিত কবরী হইয়া দুঃখদগ্ধ কুক্কুরীর ন্যায় রোদন করিতে করিতে নগরের বহির্ভাগে নিপতিত হইল।"

মাতালী যখন অর্জুনকে অমরাবতীতে নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন অর্জুন রথে বসে রথের যাত্রারম্ভের ঝাঁকুনি সামলে নেন। তখন মাতালি বলেন, তুমি এই ক্ষেত্রে দেবাদিদেব মহারাজ ইন্দ্রকেও ছাড়িয়ে গেছ। একটি স্থির যান চালু হলে প্রচণ্ড গতিবেগের জন্য যাত্রীদের ঝাঁকুনি লাগতে পারে। ওই ঝাঁকুনি বর্ণনা দিয়ে গেছেন মাতালি।

মহাবীর রচিত জৈনশাস্ত্রের 'ভাবভূতি' গ্রন্থে রয়েছে। পুষ্পক নামক বিমানে করে বহুলোক অযোধ্যায় যাতায়াত করতো। অযোধ্যার আকাশ বিমানে কালো হয়ে থাকতো। বিমান আকাশে ওড়ার সময় আকাশ হলুদ হয়ে যেতো। রামচন্দ্রের সঙ্গে অশ্বিনীগণের যে যুদ্ধ হয় তা ছিল ভয়ঙ্কর। চন্দ্রে এই যুদ্ধ হয়। প্রচুর নভোযান ব্যবহার করেছিলেন ভগবান রামচন্দ্র। এবং রামচন্দ্রের ৭টি ঋষিনগরে বিমান যাতায়াত ব্যবস্থা ছিল। রাবণ রথের সাহায্যে সীতা হরণ করেন। রামায়ণে এই বায়ুযানের কথা বলা আছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, কুবের, যম, দেবরাজ ইন্দ্র বিমান ব্যবহার করতেন। হিন্দু মাইথোলজি বা পুরাণের আনাচে-কানাচে বিমান ব্যবহারের কথা আছে।

যেহেতু ভারতের আকাশে প্রাচীনকালে বিমান উড়তো তাই বিমানশাস্ত্রও ছিল। ঋষি ভরদ্বাজের "বৃহৎ বৈমানিক শাস্ত্র", আচার্য নারায়ণ মুনির "বিমান চন্দ্রিকা", ঋষি শোণিকের "বিমান যাত্রা", গর্গ মুনির "যাত্রা কল্প", আচার্য বাচস্পতির "বিমান বিন্দু", মহর্ষি ধুপধিরাজের "বিমান জ্ঞানরকা প্রকাশিকা"-এর সঙ্গে চাণক্যের নামও জড়িয়ে গেছে। ১৯৯১ সালে ডেভিড হ্যাচার চাইল্ডরেস প্রাচীন বিমান শাস্ত্রের উপর একটি বই লেখেন। বইটির নাম "বিমান এয়ার ক্রাফট ইন্ডিয়া এবং আন্টলান্টিস এজ এ পার্ট অফ লস্ট সায়েন্স"। এই বইটিতে ঋষি ভরদ্বাজের "বৃহৎ বৈমানিকা শাস্ত্রের" অনুবাদ রয়েছে। বইটিতে আটটি অধ্যায় রয়েছে। অধ্যায় নিম্নরূপ—

(১) বিমানের সংজ্ঞা, (২) একজন বিমান চালকের সংজ্ঞা, (৩) বিমান পথ, (৪) খাদ্য, (৫) কাপড়-চোপড়, (৬) ধাতু ও ধাতু উৎপাদন, (৭) আয়না যুদ্ধে তার ব্যবহার, (৮) অন্যান্য যন্ত্রপাতি অন্যান্য যন্ত্রপাতিকে ভাগ করা হয়েছে— (১) মন্ত্রিক, (২) তান্ত্রিক ও (৩) কৃতক।

ভরদ্বাজ চার প্রকার বিমানের কথা বলেছেন— (১) শকুন, (২) সুন্দর, (৩) রোকমা, (৪) ত্রিপুরা। বইটির চল্লিশ ভাগের এক অংশ মাত্র যন্ত্র সর্বস্ব।

ঋক্‌বেদ পর্যন্ত বিমান রথ নামে অভিহিত হোত। যর্জুবেদে এসে দাঁড়ায় রথ থেকে বিমান।

ঋক্‌বেদে যে সমস্ত যানের কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে—

(১) জলায়ন— যা জলে এবং হাওয়ায় চলতে পারে (ঋক্‌বেদ ৬.৫৮.৩)।
(২) কার-কারা— যান যা মাটিতে ও জলে চলতে পারে (৯.১৪.১)।
(৩) ট্রিটলা— তিন তলা যান (৩.১৪.১)।
(৪) ত্রিচক্র— তিন চক্ররথ (৪.৩৬.১)।
(৫) বায়ুরথ— গ্যাস অথবা বায়ু দ্বারা চালিত (৫.৪১.৬)।
(৬) বিদ্যুৎ রথ--- বিদ্যুৎ দ্বারা চালিত (৯.১৪.১)।

ঋক্‌বেদে আবার বিমানকে দু-ভাগে ভাগ করেছে—

(১) অনিহিতো— যার দুটো ইঞ্জিন রয়েছে।
(২) গজ— যার দু-এর অধিক ইঞ্জিন রয়েছে।

অগস্ত-সংহিতায় আবার তিন প্রকার বায়ুযানের কথা বলা হয়েছে। যথা— (১) ছত্র, (২) বিমান বিগুনম, ও (৩) অগ্নিযান।

শৌনক অনুসারে ব্রহ্মাণ্ডে ৫টি আকাশ আছে। যথা— (১) রেখাপথ, (২) মণ্ডল, (৩) কাকস্য, (৪) শক্তি ও (৫) কেন্দ্র।

৫টি আকাশে ৫১৯৮০০ আকাশ পথে বিমান সাতলোকে যেতে পারে। এই লোকগুলো হচ্ছে— (১) ভূলোক, (২) ভূধরলোক, (৩) সুরলোক, (৪) মহালোক, (৫) জনলোক, (৬) তপলোক, (৭) সত্যলোক।

বাল্মীকি-গণিতে আকাশ পথের সংখ্যা নিম্নরূপ—

রেখাপথ— ৭০৩০০৪০০ আকাশ পথ
মণ্ডল—২০৮০০২০০ আকাশ পথ
কাকস্য—২০৯০০৩০০ আকাশ পথ
শক্তি—১০০১৩০০০ আকাশ পথ
কেন্দ্র—৩০০৪২০০ আকাশ পথ

ঋষিগ্রন্থে সবকিছুর সংক্ষিপ্ত ও নীতিগত বর্ণনা আছে। তাই সব কিছুর ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়।

১৯৭৩ সালে ভারত সরকারের একটি গবেষণা সংস্থা "বৃহৎ বৈমানিক শাস্ত্র"কে গুরুত্ব দিতে অস্বীকার করে। বৃহৎ বৈমানিক শাস্ত্রের মত অনুযায়ী মেটালে বা ধাতুতে বিমান ভারী হবে। তাই উড়ানযোগ্য নয় বলে দাবি করেন তাঁরা।

১১ অক্টোবর ১৯৮৮ সালে 'হিন্দু' পত্রিকায় একটি খবর প্রকাশিত হয়। সেই খবর অনুযায়ী ব্যাঙ্গালোরের 'ওয়ার্ল্ড স্পেস কনফারেন্স'-এ ডঃ রার্বাতো পিনেত্তি নামে এক মহাকাশ-বিজ্ঞানী ভারতীয় প্রাচীন শাস্ত্রের উপর তার গবেষণার কথা বলেন, ত্রিপুরা বিমান সূর্যালোকের দ্বারা চলতো। তিনি ভারতের অগ্নির ব্যবহার এবং সমর সূত্রধর বিমানের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

১৯৯১ সালে হেচারের বইটি প্রকাশ পায়। অন্যদিকে সি এস আর প্রভু যিনি হায়দ্রাবাদের এন আই সি-এর একজন সিনিয়র বিজ্ঞানী। ইন্দো-নেপাল সংস্কৃত চর্চায় তিনি বলেন, নেপালের রয়্যাল লাইব্রেরিতে সুব্বারার্য শাস্ত্রীর মহাকাশ বিজ্ঞানের বিষয়ে গ্রন্থ রয়েছে। ওই গ্রন্থটি ১৮৭৫ থেকে ১৯১৯ খৃস্টাব্দের মধ্যে লেখা হয়। কথিত আছে তিনি যোগবলে এই বই লেখেন। এই বইতে—(১) কারিগরি দিক, (২) ধাতু, (৩) ফেব্রেকেটিং, (৪) ইরেক্টিং, (৫) ধাতু সহযোগী ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে।

পুণের 'কেশরী' পত্রিকা একটি খবর দেয়। গোয়ালিয়রের মহারাজ সায়াজিরাওগাইকোয়াডের অনুপ্রেরণায় তলপেনদে মার্কারি ইঞ্জিন এয়ারক্রাফট (বৈদিক) তৈরি করেন। তা মানুষবিহীন (আজকের দ্রোণ) অবস্থায় ১৫০০ ফিট যেতে সক্ষম হয়। তা ভারতের প্রাচীন মার্কারি ইঞ্জিন বক্সের কার্যকারিতার ১৮৯৫ সালে তলপেনদে প্রমাণ করেন।

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক
স্বস্তিকা
পড়ুন ও পড়ান

নবাঙ্কুর

হোতু-কোতু উপাখ্যান

ভেজাল-রোধের ভাবনা

ছেলেটা একটু খুঁড়িয়ে হাঁটছিল। হোতুর চোখে পড়ল। বেশ সুন্দর গড়ন। চলাফেরায় অসুবিধে রয়েছে একটু। কারণ কি? অনেকগুলো প্রশ্ন মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। পথচলতি কত মানুষকে তো রোজ দেখে, সকলের ক্ষেত্রে ওইরকম মনে হয় না। জানার ইচ্ছেও হয় না। কোনও কোনও সময় কিছু ভাবনা মনে ভিড় করে। ছোটোদের চলাফেরায় বা বলায় কোনও অসুবিধে থাকলে মনের মধ্যে প্রশ্ন সাজায়, কেন এত কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছে ছেলেটা বা মেয়েটাকে। হয়তো তার কিছু করার ক্ষমতা নেই। তবু জানতে চায়। মনতো সবচেয়ে গতিময়। কখন কোন্ দিকে ছুটে যায় কে জানে! ছেলেটা ঢুকেছিল পাশের বইয়ের দোকানে। হোতুর দোকানে তখন কোনও খদ্দের কোনও জিনিসের দাম মাত্রাছাড়া নয়। অর্জুন রায়ের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক হোতুরও। এটাসেটা তো প্রায়ই দরকার হয়। হোতু চিরকুটে লিখে পাঠায় চিকলিকে দিয়ে। অর্জুন সঙ্গে সঙ্গে পাঠায়। দামটা লিখে দেয়। হোতু টাকা পাঠিয়ে দিতে দেরি করে না। অর্জুন নানারকম বই পড়ে। হোতু শুনেছে, অর্জুন ভালো সেতার বাজায়। সেটা তার নির্জন সাধনা। অনেকগুলো কারণে হোতুর প্রিয়জন অর্জুন।

ছেলেটা তখন বই দেখা শুরু করেছে অর্জুনের দোকানে। দোকানের নাম 'কল্পতরু'। অর্জুন অনেক বই ছেলেটিকে দেখাচ্ছে। হোতু দোকানে ঢুকতেই অর্জুন বলল 'আসুন হোতুদা।' হোতু কোনরকমে ভূমিকা না করেই বলল, 'এই তেলেভাজা এসেছিল। বাবা-ঠাকুমা ছাড়া সকলে অসুস্থ হয়ে পড়ে। ওরা দুজনে খায়নি। আমার এক দিদি তো এখনও ভালো করে হাঁটতে পারে না।' হোতু জিগ্‌গেস করল, 'সেই তেলের দোকানদারের কি হলো?' ছেলেটি বলল, 'তার জেল হয়েছিল। জেল থেকে বেরিয়ে দোকান বিক্রি করে দেশে চলে যায়।' ছেলেটির নাম জেনে গিয়েছে হোতু। অনির্বাণ চক্রবর্তী। মন দিয়ে সবকথা শুনে নিয়েছে অর্জুন। সে যতটা বেশি সম্ভব ছাড় দিল অনির্বাণকে। অনির্বাণ বলল, 'আমি এখন একটা কেন্দ্রীয় সরকারের একটা অফিসে কাজ করি। বই পড়ে সময় কাটাই। বেশি ঘুরতে তো পারিনা। পড়ি আর আঁকি। একটু-আধটু লিখি।' অর্জুন বলল, 'ইনি

ছিল না। এমনিতেই কেনাবেচা কম। চিকলিকে বলল হোতু, 'তুই কিছুক্ষণ দোকান সামলা। আমি ঘুরে আসছি অর্জুনের দোকান থেকে।' অর্জুন শুধু বই বেচে না। খাতা পেনসিল, খেলাধুলোর জিনিসপত্রও বেচে।

অর্জুনের ব্যবহার খুব ভালো, যেটা ব্যবসার বড় গুণ। সকলে তার দোকানে ভিড় করে। পাশে নগেন ঘোষের দোকান। একই জিনিস বেচে। কিন্তু তার দোকানে কোনও সময়েই ভিড় থাকে না। কারণ একটাই, নগেনের ব্যবহার ভালো নয়। বড় রুক্ষ মেজাজ। ক্রেতাদের সঙ্গে ঠিকমতো ব্যবহার করতে জানে না। সেজন্যে খদ্দেররা তাকে এড়িয়ে চলে। অর্জুন সকলকে আপন করে নিতে জানে। চটপট কাজ করে। দোকানে ভালো জিনিস রাখে। লাভ অবশ্যই করে, কারণ ব্যবসা তো দানছত্র নয়। তবে ছেলেটিকে দেখে মনে কিছু প্রশ্ন উঁকি দিল তা জানার জন্যেই চলে এলাম।' অর্জুন আর ছেলেটি অবাক। হোতু বলল, 'তোমরা বই কেনা বেচার কাজ করো। অসুবিধে ঘটাবো না। শুধু জানতে চাই তোমাকে এত কষ্ট করে হাঁটতে হচ্ছে কেন? যদিও এটা একেবারে ব্যক্তিগত প্রশ্ন। তুমি না চাইলে বোল না।'

ছেলেটি সুন্দর হেসে বলল, 'অনেকে জিগ্‌গেস করে। আপনিও করলেন। বলছি।' পাঁচটা বই অর্জুনকে দিয়ে বলল, 'ক্যাশমেমো করুন।' এরপর হোতুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'কাকু, হয়তো আপনার মনে আছে বেশ কয়েক বছর আগে দমদমে সরষের তেলে প্লাসটিক কেমিক্যাল ভেজালের একটা ঘটনার কথা। ষাটজন মারা যায়, অসুস্থ হয় একশোর বেশি লোক। আমাদের বাড়িতে পাড়ার দোকানের আমাদের হোতুদা। সকলের প্রিয়। ব্যবসায়ী। তবে হৃদয়বান।' হোতু বলল, 'তুমি আবার যখন আসবে আমার দোকানে অবশ্যই এসো।'

হোতুরা একসময় ভেজালের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিল। জনচেতনা জাগানোর চেষ্টা ছিল বিভিন্ন স্তরে। দমদমের সরষের তেলওয়ালার মতো আরও বহুজন ছিল। কতজনের ক্ষতি করেছে হিসেব নেই। পুলিশের লোকজন ওই ভেজালদারদের কাছ থেকে টাকা নেয়। মূল পাণ্ডাকে ধরে না পুলিশ। তার হয়ে অন্য লোক জেল খাটে। হোতু বলল ছেলেটিকে, 'তোমার মতো অনেকের ক্ষতি করছে যারা, তাদের বিরুদ্ধে প্রচারে তোমাকে পাবো তো?' অনির্বাণ বলল, 'অবশ্যই'। অর্জুন বলল, 'আমিও থাকবো হোতুদা।'

কৌশিক গুহ

বই কথা কই

ছোটোরা ভালোবাসুক বই

বই হাতে পেলে দারুণ খুশি ঋদ্ধি। খেতে ভালোবাসে। নানারকম খাবার দেখেশুনে খায়। যখন তখন যা খুশি খাওয়ার অভ্যেস নেই। ঠাকুমা বলত, 'মুখরোচক খাবার অবশ্যই খাবে। তবে সবসময় নয়। ভালো পুষ্টিকর সুস্বাদু সহজপাচ্য খাবার চাই শরীর আর মনকে গড়ে তোলার জন্যে। শরীর ঠিকমতো গড়লে অনেক কাজ সম্ভব।'

ছোটোদের তিনটে কাজ— খাওয়া-খেলা-পড়া। কোনওটাতেই ফাঁকি চলবে না। ভালো খাবার পেটভরে খেতে হবে। সাধারণ খাবারই পুষ্টিকর। বেশি দাম দিয়ে খাবার কিনলেই ভালো হয় না। খেলতে হবে রোজ। ঘরে বসে খেলা নয়। দৌড় ঝাঁপ করে খেলতে হবে। খেলার পর বিশ্রাম। তারপর পড়া। বুঝে পড়া দরকার। সেজন্যে স্কুলে বা বাড়িতে কেউ-না-কেউ সাহায্য করবেন। পড়া বোঝার সঙ্গে তা মনে রাখা চাই। পড়ার মধ্যে আনন্দ খুঁজে পেলে কোনও ভাবনাই থাকে না। এগিয়ে চলা সহজ হয়ে ওঠে।

চারপাশে কতকিছু ছড়ানো। ছোটোরা শুধু বইবন্দী হয়ে থাকবে না। মনের জানলা খুলে, ঘরের জানালা খুলে চারদিকে লক্ষ্য রাখবে। কিছু বোঝা আর অনেক না-বোঝার মধ্যে দিয়েই এগোবে শিক্ষা। লাইব্রেরিতে কত বই। একজনের পক্ষে সব বই পড়া সম্ভব নয়। কিন্তু মনে রাখা দরকার, বহু মানুষ বহু বছর ধরে কত গভীর মনোযোগে রাশি রাশি বই তৈরি করেছেন। সেসব বই আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতির গৌরবের কথাই তুলে ধরেছে। ধারাবাহিকভাবে কাজ হয়েছে। আসছে উজ্জ্বল আগামীদিন। ছোটোদের শরীর সুগঠিত, মন সমৃদ্ধ হলে তারা অনেক বাধা পেরিয়ে ছুটে যাবেই।

বইমিত্র

প্রশ্নবাণ

১. গঙ্গা কোন্ কোন্ নগর ছুঁয়ে গেছে?

২. বান্ধবগড় ন্যাশনাল পার্ক কোথায়?

৩. ভাকরা-নাঙ্গাল বাঁধ কোন্ নদীর উপরে? কোথায়?

৪. বিহু, গরবা, কথাকলি, ভাংরা, কুচিপুড়ি কোন্ কোন্ প্রদেশের নাচ?

৫. ভারতের দীর্ঘতম জাতীয় সড়ক? কোথা থেকে কোথা?

উত্তর : ১. কানপুর। বারাণসী। হরিদ্বার। এলাহাবাদ। পাটনা। কলকাতা। ২. মধ্যপ্রদেশ। ৩. শতদ্রু। পাঞ্জাব। ৪. অসম। গুজরাত। কেরল। পাঞ্জাব। অন্ধ্রপ্রদেশ। ৫. এন এইচ ৭। বারাণসী থেকে কন্যাকুমারী।

ছোটোদের বলছি

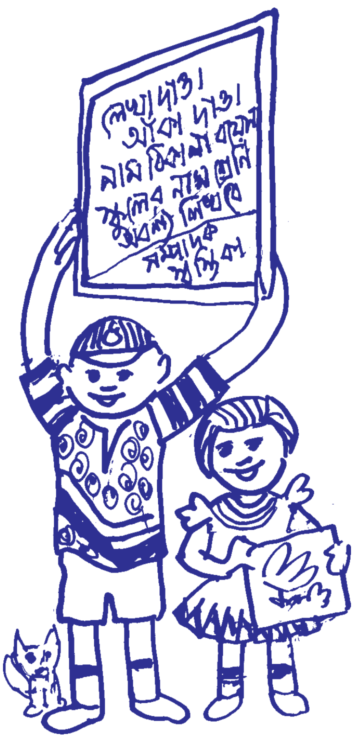

উলটো পালটা

পরীক্ষার কদিন বাড়িতে বকুনি কম। সন্তু ক্লাস সেভেনে পড়ে। পড়ার থেকে খেলাতেই ঝোঁক বেশি। ক্রিকেট ভালোই খেলে। পরীক্ষার দিন সন্ধেবেলা বাবা জিগ্‌গেস করল, 'সন্তু পরীক্ষা কেমন হলো?'

সঙ্গে সঙ্গে সন্তুর জবাব, 'ভালোই।'

এরপর বাবার প্রশ্ন, 'কত নম্বর হবে?'

সন্তু উত্তর দিল, 'পঁচানব্বই।'

বাবা জিগ্‌গেস করল, 'একশো হবে না কেন? ইতিহাসে তো একশো পাওয়া যায়।'

সন্তু বলল, 'একটু ভুল না হলে একশোই পেতাম। আমি খেলার মাঠে সবসময় ইন্ডিয়া শুনি। আমাদের দেশের নাম যে ভারতবর্ষ সেটা পরীক্ষা দেওয়ার সময় মনে পড়েনি। নম্বর তো কাটবেই।'

২

ধৃতিকান্ত বাড়িতে রোজ ঝগড়া করেন বউয়ের সঙ্গে। বলেন, 'সারাদিন রান্নাঘরে থাকো, অথচ কি যে রান্না করো মুখে তোলা

যায় না। আমি একদিন মাংস রাঁধবো। দেখিয়ে দেবো, রাঁধতে হয় কেমন করে।'

ধৃতিকান্ত একদিন রাঁধলেন। জিনিসপত্র দোকান থেকে কিনে আনলেন। রান্নার পর বেশ তরিবত করে খাবেন ঠিক ছিল। বউ কয়েকবার চেখে দেখলেন।

ধৃতিকান্ত বাটিভর্তি মাংস একটু মুখে দিয়েই গিন্নিকে বললেন, 'তুমি এতবার চেখে দেখছো, একবারও তো বললে না নুন কম।'

তাঁর গিন্নি বললেন, 'তুমি যাতে আবার রাঁধতে না যাও সেজন্যে।'

অঙ্গনা

মুসলিম মহিলাদের কড়া হুমকির পাশে খোলা জানালা

মিতা রায়

মুসলিম সমাজে মধ্যযুগীয় সময় থেকেই চলেছিল মহিলাদের প্রতি নানা ফতোয়া। যুগে যুগে যাই পরিবর্তন আসুক না কেন; এইসব গোঁড়ামির ফতোয়া আজও চেপে বসে আছে মহিলাদের ক্ষেত্রে। একেক শতাব্দী পেরিয়ে একবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে পৌঁছেও সভ্যতার আলোয় মুসলমান সমাজের নারীরা আলোকিত হয়নি। অন্ধকার সংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে আছে মুসলিম সমাজের একাংশ। মুসলিম মহিলাদের ওপর কঠোর ফতোয়া জারি রয়েছে অত্যাধুনিক উন্নত দেশেও।

একদিকে প্রযুক্তি বিজ্ঞানের উন্নতিতে পৃথিবীটা হাতের মুঠোয়, অন্যদিকে মুসলিম মহিলাদের প্রতি কঠোর ফতোয়া পোশাকের ক্ষেত্রে। সম্প্রতি দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশ (গত আগস্টের ১৩ তারিখে) কাশ্মীরে আজও মহিলাদের বোরখাপরা বাধ্যতামূলক; শুধু তাই নয়; অন্যথা হলেই নাকি মুখে অ্যাসিড ছোঁড়া হবে— এমন কড়া হুঁশিয়ারি জারি হয়েছে। এর সঙ্গে আরও এক ভয়ঙ্কর নির্দেশ তা হলো, বর্তমানে মোবাইলের মতো সুলভ দূরভাষের সদ্ব্যবহার করতে পারবে না মহিলারা। যদিও এই দুই হুমকি দিয়েছে দুটি জঙ্গিগোষ্ঠী। লস্কর আল কায়দা ও আল কায়দা মুজাহিদ্দিন। প্রশাসনের ওপর তাদের প্রভাব যে কতখানি তার প্রমাণ মিলেছে এই হুঁশিয়ারিতে।

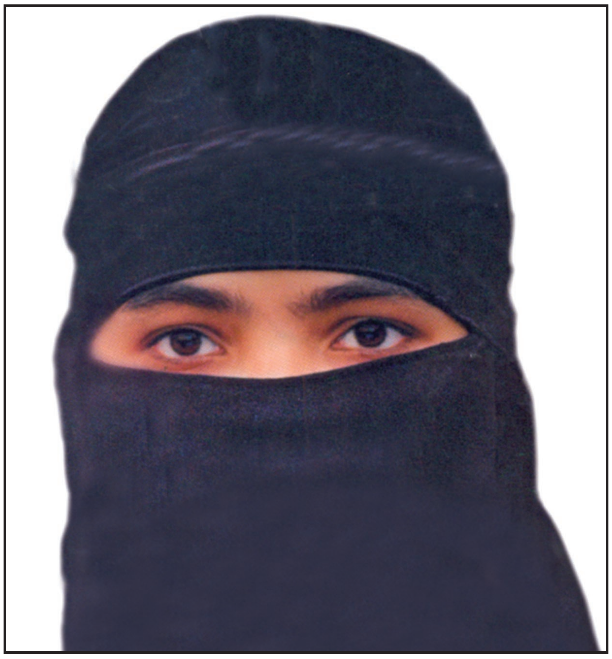

জঙ্গিগোষ্ঠী দুটি পোস্টার দিয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে সর্বত্র। সোপিয়ান জেলার মসজিদে পাওয়া গেছে এই ধরনের পোস্টার। এখানে প্রশ্ন জাগে যে, মহিলারা কি মনুষ্যপদবাচ্য নয়— এমনই মনে করে তারা? অথচ পৃথিবীর মাটিই তো মা। নারী না থাকলে আজ এদের পৃথিবীর আলো দেখা কি সম্ভব হোত! আজ যে হুমকি মহিলাদের প্রতি গর্জে উঠছে— তা কি বলবার মুখ থাকত মাতৃগর্ভে জন্ম না নিলে!

আবার একই সময়ে পৃথিবীর আরেকটি মুসলিম দেশে দেখা যাচ্ছে খোলা হাওয়া। সেখানে মহিলাদের জন্য নতুন নতুন চিন্তাভাবনা চলছে। চোখ রাখি সৌদি আরবে। ১৩ আগস্টের এক দৈনিকে প্রকাশিত ছোট পরিসরে বড় খবর, বিশেষত মহিলাদের জন্য। শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য গড়ে উঠবে একটা বিশাল শহর। সেখানে মেয়েদের সব রকমের কাজের ব্যবস্থা থাকবে, তাদেরই পরিচালিত বিভিন্ন শিল্প গড়ে উঠবে। এই পরিকল্পনা গড়ে উঠেছে সম্পূর্ণ শরিয়ত অনুশাসন মেনে। এ কাজ মনে হতে পারে অলীক কল্পনা মেয়েদের কাছে; কিন্তু না, ইতিমধ্যে চিন্তাভাবনা বাস্তবায়িত করতে চলেছে আগামী বছরেই। প্রমীলা শহর গড়ে ওঠা মুসলিম সমাজের মহিলাদের কাছে অবশ্যই খোলা জানালা। প্রমীলা শহর গড়ে ওঠার একমাত্র লক্ষ্য হলো, আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে তাল রেখে দেশের উন্নয়নে তরুণী যুবতীদের নিয়োগ করা। এখানে দুটি জায়গায় দু' ধরনের প্রতিক্রিয়া মহিলাদের ক্ষেত্রে। এখানেই প্রশ্ন ওঠে, মহিলারা কী জাতের ক্রীড়নক! যে যেভাবে পারবে, মহিলাদের নাচাবে, সাজাবে, খেলাবে। আর কবে যে এমন অনুশাসনের হাত থেকে মুসলিম নারীসমাজ মুক্ত হবে!

পবিত্র বনবীথিকা

অন্য রকম

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে এমনিতেই অনন্য মেঘালয়। তার ওপরে সত্তর একর জুড়ে ‘পবিত্র বনবীথিকা’ যে সেই সৌন্দর্যকে বহুগুণ বৃদ্ধি করেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অবশ্যই এটা পর্যটকদের কাছে। স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে এর মূল্য ঠিক কতটা তা নিরূপণ করার দুঃসাহস পর্যটকদের নেই। তবে স্থানীয় গাইডের ‘বিধিসম্মত সতর্কীকরণ’ অবশ্যই আপনার কানে পৌঁছবে, “এই পবিত্র অরণ্যের পাথর, ফুল কিংবা পাতা কোনও কিছু ছেঁড়ার চেস্টা করবেন না। আর যদি ভুলেও করে ফেলেন তবে তা কখনওই বাইরে (পবিত্র অরণ্যের) নিয়ে যাবেন না। নিয়ে গেলে দুর্ভাগ্য ও শারীরিক অসুস্থতা আপনাকে অনুসরণ করবে।” শিলং থেকে গাড়িতে গেলে বড়জোর ঘণ্টাখানেকের দূরত্ব। পূর্ব খাসি পাহাড়ের মফলং অরণ্যানির ভেতর চোখ জুড়নো এই ‘পবিত্র বনবীথিকা’র টানে সারা বছরই ভিড় জমান পর্যটকরা। প্রাচীন কিংবদন্তী আর লোক প্রচলিত প্রবাদ নিয়ে বনবীথিকার পবিত্রতার মহিমা যে অন্য ধরনের আবেশ সৃষ্টি করে তা বলাই বাহুল্য।

এই অপরূপ অরণ্যানির মধ্যে মধ্যে প্রাগৈতিহাসিক পাথরের উদয় হয়েছে। সেই পাথরগুলো কোনওটা অনুভূমিকভাবে, কোনওটা বা খাড়াভাবে উত্থিত হয়েছে। প্রচলিত কিংবদন্তী পুরুষ মানুষের হাড়, মাটির নিচে চাপা পড়ে ঋজু পাথরগুলির উত্থান হয়েছে আর নারীর হাড়ে অনুভূমিক পাথরগুলির সৃষ্টি হয়েছে। অনুমান এই প্রাগৈতিহাসিক পাথরগুলোর বয়স নেহাত পাঁচশোর কম হবে না। এই পাথরগুলো গোটা পরিবারের প্রতিচ্ছবিই তুলে ধরে বলে আঞ্চলিক কিংবদন্তী। এখানকার অধিবাসীদের প্রাচীনত্বও যে নেহাৎ কম নয় এই পাথরগুলিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এমন ধারণাও বলবৎ। এই ধারণাকে জোরদার করেছে একটি কিংবদন্তী, এই পাথর যে বাইরে নিয়ে যাবে অপঘাতে নাকি তার মৃত্যু হবে।

এমনতরো কত যে কিংবদন্তী এই সুবিস্তৃত ‘পবিত্র বনবীথিকা’র সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। খাসী জনগোষ্ঠীর মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস এই পবিত্র অরণ্য তাদের রক্ষা করছে দু’হাত বাড়িয়ে। মফলাং বনানীর স্রোতস্বিনী ঝরণা ও পুকুরের জল তাদের জীবন দিয়েছে। তবে পরিবেশবিদদের নিরাবেগ মানসিকতার মধ্যেও এই পবিত্র বনবীথিকা তাদের কাছেও নতুন আবেগের সঞ্চার করেছে ‘ইকোসিস্টেম’ রক্ষার অপরিহার্যতার কারণে। একথা অনস্বীকার্য পরিবেশ ও বন্যপ্রাণ রক্ষায় ‘পবিত্র বনবীথিকা’ নিঃসন্দেহে পবিত্রতর কাজ করেছে।

এই বনবীথিকার বৈশিষ্ট্য দুর্লভ অর্কিডের সংরক্ষণ যা প্রায় শতাব্দী-প্রাচীন। বহু প্রাচীন গাছপালার আবাস-গৃহ হিসেবেও এর পরিচিতি ব্যাপকতা পেয়েছে। আবার ভেষজ ঔষধ তৈরিতে অপরিহার্য সুপ্রাচীন বৃক্ষাদিও দুর্লভ নয় এখানে। চীনে বাদাম এবং মাশরুমও যথেচ্ছভাবে চাষ হয় এখানে। দুর্লভ সুপ্রাচীন গাছ-গাছালিরও অভাব নেই। উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই পবিত্র ‘বন-বীথিকা’য় ৫১৪ প্রজাতির গাছপালা রয়েছে।

ইউ পি এ : ভারতের অগ্রগতির পথে এক জগদ্দল পাথর

অতিথি কলম

এম ভি কামাথ

ইউ পি এ সরকার সম্পর্কে কী এমন কথা বলা হয়নি যা অতীতে বারবার বলা হয়নি? এটি একটি সম্পূর্ণ ব্যর্থ সরকার। এ এক বিশাল বিপর্যয়ের প্রতিভূ। এর নেতৃত্বে কোনও উল্লেখযোগ্য নাম নেই। এর কোনও লক্ষ্য নেই। এটি একটি পারিবারিক ব্যাপার। কংগ্রেস যদিও আছে তবে তা একটি অন্ধ হাতির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে; গন্তব্যহীন যাত্রাপথে করে চলেছে অবর্ণনীয় ক্ষয়ক্ষতি; পরিণত হয়েছে একটি অসুস্থ জোকার-এ। কেউ জানে না, কে একে চালাচ্ছে। প্রণব মুখার্জী যে মুহূর্তে তার অর্থমন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করেছেন, সেই মুহূর্ত থেকে শুরু হয়েছে তাঁর দেওয়া বাজেট প্রস্তাবগুলো ছেঁটে ফেলার উদ্যোগ। যেন মনে হচ্ছে সরকার অপেক্ষা করছিল কবে শ্রী মুখার্জী যাবেন!

কে এই দলটি চালাচ্ছে? নিশ্চিত ড. মনমোহন সিং নন, যিনি অকর্মণ্য বলে নিন্দিত হয়েছেন এমনকি টাইম ম্যাগাজিন দ্বারাও। তাহলে কী প্রণব মুখার্জী? শোনা যায় তিনি সোনিয়ার আস্থাভাজন নন এবং রাষ্ট্রপতি পদে তাঁর মনোনয়নটিও ছিল একান্তই দুর্ঘটনা। তাঁকে প্রায়ই মন্ত্রীমণ্ডলীতে দু-নম্বর ব্যক্তি হিসাবে বর্ণনা করা হোত তার বিবাদ-বিতর্ক সামাল দেওয়ার দক্ষতার জন্য। কিন্তু প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধানের বিবাদের সময় তিনি কোথায় ছিলেন? আজ যদি এক নম্বর ব্যক্তিটি কিছু করতে না পারেন, বর্তমান দু-নম্বর ব্যক্তি এ. কে. অ্যান্টনির কাছে কী আশা করা যায়? এই ব্যক্তিটি আজ এই এক নম্বর ব্যক্তিটিকে লিখছেন যে সেনাবাহিনী কার্যত রাগে ফুঁসছে তাই অবিলম্বে সঠিক দৃষ্টি দেওয়াটা অত্যন্ত জরুরি। সেই বার্তালাপটিও এখন প্রকাশ্য আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

> **কংগ্রেস খাদের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে। স্বাভাবিকভাবে নির্বাচন হওয়ার কথা ২০১৪ সালে। কিন্তু দেশের অবস্থা হাল ক্রমশই সঙ্গীন হয়ে উঠেছে। তাই শোনা যাচ্ছে নির্বাচন মার্চ, ২০১৩ সালের মধ্যে করা হবে। ইউপিএ-র দিন শেষ হয়ে আসছে। এখন শেষের সেই দিন গোণার পালা।**

অ্যান্টনি'র ড. সিং-কে লেখা পত্রটি কি ইচ্ছাকৃতভাবে ফাঁস করা হয়েছিল? যদি তাই হয়, তাহলে কার দ্বারা? বাহিনীর ভিতরকার শৃঙ্খলা কী ভাঙনের মুখে? বাহিনী যদি এভাবে ভেঙে পড়ে, তাহলে আমরা নিরাপত্তার জন্য কার দিকে তাকিয়ে থাকব? বিগত কয়েক মাস যাবৎ ইউ পি এ সরকার হয়ে উঠেছে দুর্নীতির অপর নাম। ভুলে যান টু-জি। ভুলে যান সমস্ত কংগ্রেসীদের, যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং জেলেও পাঠানো হয়েছিল। ভুলে যান এ. রাজাকে। ভুলে যান সুরেশ কালমাদিকে। আমরা দেখছি কীভাবে জীর্ণ-শীর্ণ কংগ্রেস একের পর এক নির্বাচনে পরাজিত হচ্ছে বিহার, তামিলনাড়ু, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ এবং অধুনা অন্ধ্রপ্রদেশেও, যেখানে একদা এই দুর্নীতিগ্রস্ত কংগ্রেস শাসকরাই শাসন করত।

প্রথমত, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছিল কংগ্রেসের শিরঃপীড়া। তাঁর দলের অধীন রেল দপ্তর (মন্ত্রক)-এর হাল বেহাল। প্রায় প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও ট্রেন দুর্ঘটনা লেগেই ছিল। কোথাও কামরা ভস্মীভূত হচ্ছিল, কোথাও বা যাত্রীরাই মুরগীর মতো রোস্ট হচ্ছিলেন। রেলমন্ত্রী দুর্ঘটনাস্থলের ধারে-কাছেও থাকতেন না। শারদ পাওয়ার তো একজন বখে যাওয়া ছেলের মতো। পাওয়ার-এর মাত্র ৯ জন এমপি আছে লোকসভায় কিন্তু আচরণে তিনি মমতার মতোই আস্থাহীন। তিনি চারিদিকে রটিয়ে বেড়ান যে ইউপিএ সরকার তাঁর মতো একজন প্রবীণ কংগ্রেসীকে সম্মান দেয় না— প্রবীণ বলতে তিনি আর কী কী বোঝেন তা তিনিই একমাত্র বলতে পারেন। কানে কানে অনেকে বলেন যে মহারাষ্ট্রে তাঁর দলের মন্ত্রীরা যেভাবে বিরাট বিরাট সেচ দুর্নীতিতে এবং ছগন ভুজবলের আত্মীয়স্বজনসহ দিল্লীতে মহারাষ্ট্র সদন তৈরি কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়েছে, তাতে তিনি নিজেকে 'এক ঘরে' মনে করছেন। এক প্রতিবেদকের ভাষায় "পাওয়ার উপলব্ধি করেছেন, কংগ্রেসের দুর্যোগ মোকাবিলা ম্যানেজারগণ বিলাসে মগ্ন থেকে বাস্তব অবস্থাটা বুঝতে ব্যর্থ যে তাদের সঙ্গে দীর্ঘ অবস্থান এখন বিপরীত ফল দিচ্ছে।"

আদর্শ আবাসন কেলেঙ্কারি এখন ক্রমেই দুর্নীতির গভীর পাঁক তৈরি করেছে। আদর্শ বহুতল বাড়িগুলি কাদের জন্য তৈরি হয়েছিল? শহীদ সেনা জওয়ানদের পরিবারগুলির জন্য? না কি মন্ত্রী আর সরকারি আমলাদের মনোনীতদের জন্য? কারা আবাসনগুলি করায়ত্ত করেছে? তার একজন হলেন সঞ্জয় শঙ্করন। কে এই সঞ্জয় শঙ্করন? তিনি হলেন মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যসচিব ডি.কে. শঙ্করনের ছেলে। তিনি এখানে ৬৫০ বর্গফুটের ২৩০২

নম্বর ফ্ল্যাটটি পেয়েছেন। আর এক অ-শহীদ এখানে ফ্ল্যাট পেয়েছেন, যিনি নাগপুরের এক মালিকের ড্রাইভার, বাৎসরিক আয় ৩৪,০০০ টাকা। এইভাবেই মহারাষ্ট্রে সেনা-শহীদত্বের কেনা-বেচা চলেছে। দুর্নীতি আজ এতটাই বিস্তৃত হয়ে পড়েছে যে নাগপুরের একজন পিওনও আদর্শ কলোনীতে একটি ফ্ল্যাট কিনতে পেরেছে। বেচারা আন্না হাজারে। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর মতো করে একটি লোকপাল বিল পাশ হোক; তিনি অনশন আন্দোলন শুরু করলেন। এটা নিশ্চিত করেই বলা যায় যে সরকার যদি প্রতিশ্রুতি দিয়েও থাকে, তবুও তাতে কিছু জারিজুরি রেখেই দেওয়া হবে।

'দি নিউ ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' পত্রিকার ১৮ জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে গত দশকে দেশে দুর্নীতির দাপটের পরিমাণ ছিল ১,৫৫,৫,০০০ কোটি টাকা এবং এর বেশির ভাগটাই ভারতের বাইরে বেআইনি লেনদেন করা হয়েছে বিভিন্ন পথে--- জানিয়েছে এক সমীক্ষা। ইউপিএ সরকার কী করেছে। কিছুই না! এই বিপুল পরিমাণ অর্থ নিশ্চিন্তে রয়েছে সুইস ভল্টে। এই সমীক্ষাটি করেছিল 'ইন্ডিয়া ফরেনসিক' নামে পুণের একটি কোম্পানী।

ইউপিএ জামানায় বিচার-ব্যবস্থার দুর্নীতি আমাদের জীবনের অঙ্গ। ২০১১ সালের ২৩ মার্চ, 'দি ফ্রি প্রেস জার্নাল' প্রকাশ করে জানিয়েছে যে সুপ্রিম কোর্ট একজন প্রাক্তন প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে ১৬টি দুর্নীতির অভিযোগ, জমি বেদখল, বিচারপতির পদের অপপ্রয়োগ ও প্রমাণ লোপাটের ঘটনা সত্যে প্রমাণিত হয়েছে। ওই প্রধান বিচারপতির কি শাস্তি হয়েছে? আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি এখন, ভাবুন! কোনও কিছুই হচ্ছে না। খবরে প্রকাশ, সংসদের অধিবেশন ১৯৫০'-এর দশকে ছিল ১২৭ দিন, সেটাই ২০০১-তে নেমে এসেছে ৭৩ দিনে। কারও কিছু চিন্তা নেই। 'টাইমস্ অব ইন্ডিয়া' সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, লোকসভার স্পিকার মীরাকুমার ৩৫ মাসে ২৯ বার সফর করেছেন। তিনি বিদেশে গেছেন প্রতি ৩৭ দিনে ১ বার করে— এর মধ্যে বেশিবার গেছেন সুইজারল্যান্ডে, যে দেশ কালোটাকা রাখার জন্য কুখ্যাত। এই সমস্ত পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যাচ্ছে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো কতটা তাপ-অনুতাপহীন, বিশেষ করে শাসকদল, যারা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রয়োগ-পদ্ধতি কার্যকর করতে নিশ্চেষ্ট। টাকার দাম সর্বকালীন নীচে নেমে গেছে এবং আবার ঘুরে দাঁড়ানোর আশা খুব কম। আমাদের চিরপরিচিত অর্থনীতির আজ রক্তক্ষরণ হচ্ছে। তেমনই অবস্থা ইউপিএ-র প্রশাসনের। খবরে প্রকাশ, বারবার সরকারি বিজ্ঞপ্তি সত্ত্বেও সারা দেশের ১৪৩ জন আই এ এস অফিসার (এর মধ্যে কর্ণাটকের ৭ জন) ২০১১ সালের জন্য তাদের সম্পত্তির হিসাব দাখিল করেননি। তারা কী এখনও নিশ্চিন্তে কাজ করে যাচ্ছে, না কি, তাদের চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে? এ আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি? আমেরিকার পিউ-রিসার্চ সেন্টারের করা এক সমীক্ষায় প্রকাশ যে এক বছর আগেও ৫১ শতাংশ মানুষ সরকারের কাজে সন্তুষ্ট ছিল আর এখন ৫৯ শতাংশ মানুষ অসন্তুষ্ট।

পিউ-র সমীক্ষা অনুযায়ি, অর্থনীতির সম্পর্কে জনগণের মনোভাব ২০০৮ সাল থেকে বিরক্তিকর হতে শুরু হয়। কাকে এর জন্য দায়ী করা যাবে? নিশ্চয়ই ড. মনমোহন সিংকে নয়। রাহুল গান্ধীকে দায়ী করা কি ঠিক হবে? তিনি তো লোকসভায় একটিও বুদ্ধিদীপ্ত কথা বলেননি এই কয়েক মাসে। অথচ ক্রমেই দাবি জোরালো করা হচ্ছে যে তাঁকেই নেতৃত্ব দিতে হবে। কিন্তু প্রকৃত নেতৃত্বদানে তিনি মনে হচ্ছে অক্ষম। সম্প্রতি 'টাইমস্ অব ইন্ডিয়া' পত্রিকায় প্রকাশিত এক নিবন্ধে জগদীশ ভগবতী ও অরবিন্দ পানাগারিয়া লিখেছেন, "সোনিয়ার ভগ্ন স্বাস্থ্যের সঙ্গে সঙ্গে রাহুল তার ঐতিহাসিকভাবে নিশ্চিন্ত আসনেও ভোটারদের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করতে ব্যর্থ, তাই নেহরু-গান্ধী পারিবারিক ব্র্যান্ড নামের চমকও আজ অন্তর্হিত, এই অবস্থায় ২০১৪-র নির্বাচনে কংগ্রেসের সাফল্যের আশা অনেকটাই ফিকে দেখাচ্ছে।" সঙ্গে এটাও যোগ করা হয়েছে যে "কেবলমাত্র ফলাফলই বলে দেবে এই দল টিক্‌বে কিনা", কংগ্রেস দল কি করে টিকতে পারে যেখানে তাদের কোনও জাতীয় নেতাই নেই? সোনিয়া রোগ দীর্ণ, তাঁর কাছে আর আশা করা যায় না সারাদেশ ঘুরে ঘুরে বড় বড় সভায় বক্তৃতা দেবেন। মইলি জাতীয় নেতা নন। আমরা সকলেই জানি যে সম্প্রতি তাঁকে পিছনের সারিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দিগবিজয় সিংয়েরও তাই অবস্থা। এ কে অ্যান্টনির অবস্থাও তথৈবচ।

কংগ্রেসে কোনও জাতীয় নেতা গড়ে ওঠেনি কারণ সোনিয়া চান না কেউ তাঁর পুত্র অর্থাৎ তাঁর রাজনৈতিক উত্তরাধিকারের প্রতিযোগী হয়ে উঠুক। কেউ কেউ তাই যুক্তিসঙ্গতভাবেই ড. মনমোহন সিংয়ের নীরব প্রস্থান আশা করছেন ইউপিএ-২ -র পর্ব শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। নিশ্চিতভাবেই জনসভায় ভাষণ দিয়ে জনগণের মন জয় করার কাজটি আর তাঁর কাছে আশা করা যায় না। ইউপিএ-র কাছে আজ শুধু একটি কাজই আশা করা যায় তা হলো বিজেপি ও তার জোটের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করে খবরের কাগজে জায়গা কেনা। অবসরপ্রাপ্ত নির্বাচন কমিশনার, এস ওয়াই কুরেশীর মতে, জানুয়ারি-মার্চ মাসে বিধানসভা নির্বাচনগুলিতে প্রচার পর্বের সময় এরকম ৭৬৬টি কেনা খবরের (পেইড নিউজ) অভিযোগ কমিশন পেয়েছিল, তার মধ্যে ২৫৩টি অভিযোগ সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

সারা দেশে জনসভা করার জন্য নেতাদের সফরে বেরোতে হয় না, ঘরে বসেই তাঁরা খবর তৈরি করতে পারেন আর বাদবাকি কাজগুলো করে তাঁর জনসংযোগকারীরা। এটা আজ সকলেরই জানা হয়ে গেছে যে রাহুল গান্ধীর পক্ষে জনগণের উপর প্রভাব বিস্তার সম্ভব নয়। তাঁকে চাপ দেওয়া হচ্ছে রাজনীতিতে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করার জন্য, কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ জানে না তিনি কি করছেন যদিও তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে সক্রিয় হবেন যে কোনও কাজেই। কিন্তু একটি রাজনৈতিক দলে একজনের উপর সমস্ত ভার তুলে দেওয়াটা একটি দুর্বল পদক্ষেপ। কংগ্রেস খাদের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে। স্বাভাবিকভাবে নির্বাচন হওয়ার কথা ২০১৪ সালে। কিন্তু দেশের অবস্থা হাল ক্রমশই সঙ্গীন হয়ে উঠেছে। তাই শোনা যাচ্ছে নির্বাচন মার্চ, ২০১৩ সালের মধ্যে করা হবে। ইউপিএ-র দিন শেষ হয়ে আসছে। এখন শেষের সেই দিন গোনার পালা।

(লেখক 'ইলাস্ট্রেটেড ইউকলি'র প্রাক্তন সম্পাদক, প্রসার ভারতীর চেয়ারম্যান ও একজন বরিষ্ঠ স্তম্ভলেখক)

অসম আজ কোন দিশায় ?

হরিমোহন দাস

দাঙ্গাবিধ্বস্ত অসম। (ফাইল চিত্র)

অসমের বিভিন্ন শহর আর গ্রাম-গঞ্জে কান পাতলেই স্বর্গীয় ভূপেনদার (হাজারিকা) একটি গানের সুর ভেসে আসে— 'অসম আমার রূপহী, গুনরো নাই শেষ, ভারতরে পূর্ব দিশর সূর্য ওঠা দেশ'। কথা হলো অসমের রূপ বৈচিত্র্য অর্থাৎ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মনোমুগ্ধকর একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। সবুজের সমারোহ দেখার মতো। কিন্তু এই প্রাকৃতিক সবুজের মাঝে সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ থেকে নিয়মিতভাবে আসা কয়েক কোটি সবুজ মানুষের দল। যাদের একদিন অসমীয়া হিন্দুরা--- জওহরলাল নেহরু ও কমিউনিস্টদের মতো সুর করে বলত— ''অসমীয়া-মিঞা ভাই ভাই বাঙালীর নাই এখানে ঠাঁই।'' এই মিঞা ভাইরাই এখন অসমীয়া হিন্দু ভাইদের এক গভীর সঙ্কটের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। অসমের আকাশে যে সমস্যার মেঘ আজ জমেছে তাকে জলে পরিণত করতে গেলে কত যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হবে তা অসমীয়া হিন্দুরা আজ বুঝে উঠতে হিমশিম খাচ্ছে। অসমীয়া হিন্দুরা এখন 'সাম্প্রদায়িক' রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সঙ্ঘের গুণগান করছে। কিন্তু সেদিন 'চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনি।'

প্রায় দুই মাস ধরে চলা কোকরাঝাড় জেলায় শুরু হওয়া দাঙ্গা সমগ্র অসম জুড়ে বিস্তৃতি লাভ করেছে। যে দাঙ্গাকে দেশের সব রাজনৈতিক দলই বিদেশী মুসলমানদের সঙ্গে অসমীয়া হিন্দু বোড়োদের দাঙ্গা বলে প্রচার করে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। যদি এই লড়াই বিদেশী মুসলমানদের সঙ্গে বোড়ো হিন্দুদের লড়াই হয়ে থাকে তাহলে অসমের বরপেটা, নগাঁও, তেজপুর, মহিগাঁও, গোয়ালপাড়া প্রভৃতি জেলায় কেন মুসলমানরা হিন্দুদের মারছে, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছে? হিন্দু মেয়েদের তুলে নিয়ে যাচ্ছে? আসলে সত্যটা হলো— হিন্দু-মুসলমানের লড়াই। হিন্দু অসমীয়াদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই, নিজেদের জমি ধরে রাখার লড়াই। ''স্বদেশী মুসলমান আর বিদেশী মুসলমান''— যাই বলা হোক না কেন, এদের মানসিকতা সারা বিশ্বে সমান। স্বদেশী আর বিদেশী দুই ইসলামপন্থীদের চোখেই হিন্দুরা বিধর্মী, কাফের। হিন্দু মেয়েরা ওদের কাছে ভোগের সামগ্রী, হিন্দু ঘরবাড়ি সামগ্রী লুঠপাট করা এদের কাছে ধর্মীয় কর্তব্য

> **অসমীয়া হিন্দুরাই একমাত্র মুসলমানদের হাতে কোনওদিন পরাজিত হননি। আজ সেই অসমীয়া হিন্দুরা শুধু এস এম এস-এর ভয়ে দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে দৌড়াদৌড়ি করছে। দৌড়তে গিয়ে ট্রেনের নিচে পড়ে যাচ্ছে। তারা কী ভুলে গেলেন তাদের পূর্বপুরুষ বীর চিলা রায়, যিনি একাই ঘোড়ার পিঠে চড়ে তলোয়ার হাতে নিয়ে মুসলমানদের সব আক্রমণকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়েছিলেন....**

বলে বিবেচিত হয়। তাই ধর্মনিরপেক্ষ সব সংগঠন ও রাজনৈতিক দলের কাছে প্রশ্ন— মরিগাঁও থেকে শুরু করে বিভিন্ন জেলায় যে হিন্দু মেয়েদের তুলে নিয়ে যাচ্ছে, যাদের আর কোনও খবর পাওয়া যাচ্ছে না, এদের যারা তুলে নিয়ে যাচ্ছে, স্বদেশী না বিদেশী মুসলমান।

অসমের মাটিতে ধর্মনিরপেক্ষতার চর্চা আর অসমীয়ারা ধর্মনিরপেক্ষ— এটা ভাবলে অবাক হতে হয়। কেননা অসমীয়া হিন্দুদের সর্বোচ্চ মহাপুরুষ শঙ্করদেব, যিনি স্পষ্ট ভাষায় অসমীয়া হিন্দুদের বলেছেন, ভগবান বিষ্ণুর নাম স্মরণই মুক্তির পথ।

ভগবান শঙ্করদেবের আদর্শকে বাস্তবে রূপ দিতে সঙ্ঘসহ সব অনুযায়ীই বিভিন্ন যোজনা চালিয়ে যাচ্ছে অসমে। বিদ্যাভারতীর যোজনায় সমগ্র অসম জুড়ে ৫০০-র বেশি শঙ্করদেব শিশু বিদ্যানিকেতন নামে স্কুল চলছে। এইসব স্কুলগুলির ছাত্রছাত্রীরাই আজ অসমের সেরা ছাত্রছাত্রী বলে সংবাদমাধ্যমে লেখালেখি চলছে। এই সময় অসমকে জাগরিত করতে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের উদ্যোগে (উত্তর অসম প্রান্ত) ‘বাংলাদেশী মুক্ত অসম সংগ্রাম কমিটি’ গঠন করা হয়েছে। যার নেতৃত্বে ৩০ সেপ্টেম্বর ২ লাখ লোকের সমাগম হয়ে গেল গুয়াহাটী শহরে। দুই মাস ধরে সঙ্ঘ, কল্যাণ আশ্রম, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, সেবা ভারতী, আরোগ্য ভারতীসহ সমস্ত সংগঠনের কার্যকর্তারা নিজেদের জীবন বাজি রেখে ত্রাণ ও সেবা কাজ চালিয়ে যাচ্ছে কোকরাঝাড় জেলায়।

অসমে আজ গরীব মুসলমান চোখে পড়বে না। সমস্ত জাতীয় রোডের ধারে প্রতি কিলোমিটার অন্তর ঝাঁ চকচকে মসজিদ বানিয়েছে এবং বানাচ্ছে। বাইরে থেকে প্রচুর অর্থও আসছে, আবার লোক দেখানো করে রাস্তার ধারে-ধারে মসজিদ নির্মাণের জন্য মুক্ত হস্তে দান করতে ডিব্বা বসিয়ে রেখেছে। সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ী অসমের এগারোটি জেলা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে গেছে। ভোর ৪টে ও বিকেল ৪টের সময় ঘড়ি ধরে নামাজ পড়ছে আর চারিধার থেকে নামাজের আওয়াজের ভেসে আসা ধ্বনি শুনলে মনেই হবে না যে আমি হিন্দুস্থানের একটা রাজ্য অসমে।

ভূপেনদার সুরে সুর মিলিয়ে আমরা সকলেই বলতে পারি— অসমীয়াদের গুণের কোনও শেষ নাই। প্রতিটি ব্যক্তির রক্ত কলা-সংস্কৃতিতে ভরপুর। এখানকার লোডা (ছেলে) ও শোলি-(মেয়ে) নাচতে পারে, গাইতে পারে, ভোগালি বিহুতে জমিয়ে যেতে পারে, রঙ্গালি বিহুতে কলা সঙ্গীতের উৎকৃষ্ট প্রদর্শন করতে পারে। কিন্তু যে গুণের বিকাশ আজ অসমীয়াদের মধ্যে সবথেকে জরুরি তাহলো--- দেশাত্মবোধ, সমাজবোধ, নিজেদের ও সমাজের অতীত ইতিহাসকে জানার চেষ্টা। এগুলি অর্জন করতে না পারলে ধর্ম, সংস্কৃতি সঙ্গীত কোনও কিছুকেই বাঁচানো যাবে না। তাই আজ অসমীয়া হিন্দুদের কলাগুরু বিষ্ণু রাভার গান, কবিতা, নাটক এগুলিকে বার বার শুনতে হবে, বলতে হবে। এগুলির মধ্য দিয়েই বিষ্ণু রাভা অসমে জাতীয়তাবাদের উৎকর্ষ সাধন করতে চেয়েছিলেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে আনন্দ চন্দ্র আগরওয়ালের এই কবিতাটি খুবই গ্রহণযোগ্য—

উঠা অসমীয়া চোরা চকু মেলি
এলাহ পাটিত নে লাগে লাজ?
কাঞ্চালি টোপনি ভাঞ্জি উঠি বহা
পেলোয়া পেলোরা টোকানো সাজ।

কবির এই কথা যদি শুনে অসমীয়ারা ঘুম ভেঙে ওঠে তবেই স্বামী বিবেকানন্দের ভারত উত্থানের বাণী কার্যকর হবে।

অতীতকে স্মরণ করে বলা যায় হিন্দুস্থানের মধ্যে অসমীয়া হিন্দুরাই একমাত্র মুসলমানদের হাতে কোনওদিন পরাজিত হননি। আজ সেই অসমীয়া হিন্দুরা শুধু এস এম এস-এর ভয়ে দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে দৌড়াদৌড়ি করছে। দৌড়তে গিয়ে ট্রেনের নিচে পড়ে যাচ্ছে। তারা কী ভুলে গেলেন তাদের পূর্বপুরুষ বীর চিলা রায় যিনি একাই ঘোড়ার পিঠে চড়ে তলোয়ার হাতে নিয়ে মুসলমানদের সব আক্রমণকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়েছিলেন। অসমীয়া হিন্দুরা কি ভুলে গেছে লাচিত বরফুকনের কথা যাকে অসমের ছত্রপতি শিবাজী বলা হয়। সারা দেশের মতো মুসলিমদের প্রেম (Love) জেহাদের জাল অসমকে ঘিরে ফেলেছে— লাল্টু, রাজ, দীপ, দীলিপ, গোপাল প্রভৃতি নাম নিয়ে মুসলমান ছেলেরা অসমীয়া হিন্দু মেয়েদের প্রেমজালে বন্দি করে পরে আস্তা-কুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে। অসমীয়া হিন্দু নারীদের আজ সতী জয়মতীকে স্মরণ করে তার সতীত্বের তেজ থেকে শক্তি নিয়ে নিজের সম্ভ্রম সংস্কৃতি, ধর্মকে বাঁচাতে রাস্তায় নামতে হবে।

মহাপুরুষ শঙ্করদেব মুসলমানদের হাত থেকে অসমকে বাঁচাতে সমগ্র রাজ্য জুড়ে ভগবান বিষ্ণুর নাম সংকীর্তন করার জন্য হাজার হাজার শঙ্করদেব থান নির্মাণ করে গেছেন। যে শঙ্করদেব স্বপ্ন দেখতেন সমগ্র অসমীয়া হিন্দুরা প্রতিদিন থানে গিয়ে ঢোল বাজিয়ে ভগবান বিষ্ণুর নাম সংকীর্তন করে অসমের আকাশ-বাতাস ভরিয়ে তুলবে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় বেশিরভাগ শঙ্করদেব থানই শূন্য-রিক্ত হয়ে পড়ে আছে। তাই সব দেখেশুনে আজ মনে হয় এ অসম কী জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়াল-এর স্বপ্নের অসম? যে জ্যোতিপ্রসাদ সম্পূর্ণ জীবন অসমের জন্য দিয়ে গেছেন তিনি কী এই অসমই দেখতে চেয়েছিলেন? সেই সময় কংগ্রেস নেতৃত্বকে তিনি লিখেছিলেন— “There is Something wrotten in the State of Denmark.”

বর্তমান অসমে নবীন প্রজন্মের মধ্যে স্বর্গীয় ভূপেন হাজারিকাকে নিয়ে আজ অনেক উন্মাদনা। কিন্তু ভূপেনদার ভারত মায়ের জন্য তার বুকের যে ব্যথা ব্যক্ত করে গিয়েছিলেন—

“বুকু হম্ হম্ করে মোর আই
কোনে নিদ্রা হরে মোর আই, পুত্র হৈ মই
কী মতে তরো, আই তোরে হৈ মহ মরো।”

আজ প্রশ্ন, ভূপেনদার মতো অসমীয়া হিন্দুদের মধ্যে ভারত মায়ের জন্য কি যন্ত্রণা হচ্ছে না?

জাতীয়তাবাদী বিজ্ঞানী ড: বীরেশচন্দ্র গুহ ও তাঁর অবদান

ড. সুখেন্দু কুমার বাউর

স্বাধীনতা সংগ্রাম, ভারতমুক্তি, ভারত গঠনের কাছে যে সমস্ত বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীরা আপ্রাণ সংগ্রাম ও গঠনমূলক চিন্তাধারায় নিজেদের ব্যাপৃত রেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম বিশিষ্টজন ড. বীরেশচন্দ্র গুহ।

১৯০৪ খৃস্টাব্দে বাংলাদেশের বরিশালের বানারীপাড়ায় একজন ভাবী বিশিষ্ট বিজ্ঞানী জন্ম নেন। তিনি হলেন ড. বীরেশচন্দ্র গুহ। পিতা রাসবিহারী গুহ, মাতা সৌদামিনী দেবী। তিনি বিপ্লবী অশ্বিনীকুমার দত্তের ভাগিনেয়।

বীরেশচন্দ্র বরিশালে শিক্ষাগ্রহণ করে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। ছাত্রাবস্থায় আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করে তিনমাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে কলেজ থেকে বহিষ্কার করেন তারপরে তিনি ভর্তি হন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে। অত্যন্ত মেধাবী বীরেশচন্দ্র বি. এস. সি. (অনার্স) এবং এম এস সি দুটি পরীক্ষায় প্রথম হন। আবার তিনি কিছুদিন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের তত্ত্বাবধানে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করেন। স্কলারশিপ পেয়ে গবেষণা করতে যান লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখান থেকে পি. এইচ. ডি. এবং ডি. এস. সি. ডিগ্রি লাভ করেন।

লেখাপড়ার সঙ্গে বীরেশচন্দ্র দেশের কাজও করতেন। ১৯২১খৃস্টাব্দে ১ আগস্ট সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লীগের যুদ্ধবিরোধী এক বিশাল জনসমাবেশ হয় ফ্রাঙ্কফুর্টে। বহু নবীন ও প্রবীণ ভারতীয় বিপ্লবী সেখানে যোগ দেন। ভারতীয় মুক্তিসংগ্রামে সোভিয়েত ভূমিকা নিয়ে আলোচনা হয়। বহু প্রখ্যাত ভারতীয় এই সমাবেশে যোগ দেন যেমন শিবপ্রসাদ গুপ্ত, মি. সাবুর জি শাকলাতওয়ালা, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ। বীরেশচন্দ্র সকলের মুখপাত্র হয়ে সোভিয়েত নেতাদের সঙ্গে আলোচনা চালান।

আবার বীরেশচন্দ্র বিপ্লবী যুগান্তর দলের সংস্পর্শে এসে তাদের নানাভাবে সহযোগিতা ও সাহায্য করেন। ১৯৩২ খৃস্টাব্দে ভারতে ফিরে এসে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট ফর মেডিকেল রিসার্চের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসাবে যোগ দেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সঙ্গে যোগাযোগের সময়েই দুটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ ইন্ডিয়ান কেমিকেল সোসাইটি থেকে প্রকাশিত জার্নালে প্রকাশিত হয়। সায়েন্স কলেজে পড়া ও গবেষণার সময় থেকেই যুগান্তরের বহু গোপনীয় আলোচনা ও কার্যকলাপে তিনি যোগ দিতেন। সায়েন্স কলেজে ছিল যুগান্তরের এক গোপন ঘাঁটি। ১৯৩২ খৃস্টাব্দে বীরেশচন্দ্র ভারতে ফিরে এসে অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ হাইজিন অ্যান্ড পাবলিক হেলথের প্রফেসর হিসাবে মনোনীত হলেও এই চাকরিতে তাঁকে নিয়োগ করা হলো না। কারণ বৃটিশ সরকারের পুলিশের কাছে ছিল তাঁর সম্বন্ধে প্রতিকূল রিপোর্ট।

ইন্ডিয়ান ইন্স্টিটিউট ফর মেডিক্যাল রিসার্চ নামক প্রতিষ্ঠান গড়ে যখন উঠল কয়েকজন বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় তখন তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হয়ে জনগণের কাছে আনুকূল্য চেয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রথম আবেদন পত্র লেখেন ও প্রকাশ করেন। বহু প্রতিকূলতার মধ্যে এই গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে তিনি গড়ে তোলেন, বরাবর এর কার্যকরী পরিষদের সদস্য ছিলেন। কিছুদিন বেঙ্গল কেমিক্যাল ও ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস কাজ করার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে ফলিত রসায়নের অধ্যাপক পদে গ্রহণের জন্য আহ্বান জানানো হয়। ১৯৩৬ খৃস্টাব্দে বীরেশচন্দ্র মাত্র ৩২ বছর বয়সে কলকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘোষ প্রফেসর রূপে যোগদান করেন। কিন্তু বৃটিশ সরকার বীরেশচন্দ্রের বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানে আপত্তি করেন। কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বহু চেষ্টা ও তদ্‌বিরের জন্য সরকার অস্থায়ীভাবে বীরেশচন্দ্রকে যোগদানের অনুমতি দেন।

ছাত্রাবস্থায় অধ্যাপক ড্রামন্ডের ল্যাবরেটরিতে কিছুদিন কাজ করার পর কেমব্রিজে অধ্যাপক এফ. জি. হপকিন্সের ল্যাবরেটরিতে কাজ করেন। এই সময় লন্ডনে বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক ছাত্রদের অভূতপূর্ব সমাবেশ হয় এবং ড. বীরেশচন্দ্র গুহের কার্যাবলী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফলিত রসায়ণে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়ে ইংল্যান্ডে ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে গবেষণাগার পরিদর্শন করেন। পরে ১৯৪৪ খৃস্টাব্দে ভারত সরকারের খাদ্য বিভাগের প্রধান কারিগরি উপদেষ্টা হন ও দেশ স্বাধীনের পর ১৯৪৮ খৃস্টাব্দে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের সদস্য হন। এই দুই বিভাগে বীরেশচন্দ্রের দান অপরিসীম। ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অধিবেশনে তিনি ভারত সরকারের কৃষি বিষয়ক উপদেষ্টা রূপে যোগ দেন। আবার ১৯৫৩ খৃস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে অধ্যাপনায় যোগ দেন। ভারতে লেবার পার্টি প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ড. বীরেশচন্দ্র গুহ। ১৯২৯ খৃস্টাব্দে ১ আগস্ট— দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দশ বছর আগে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লীগের দ্বিতীয় অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন শিবপ্রসাদ গুপ্ত ও তৎকালীন বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্য সাবুর জি শাকলাতওয়ালা (বৃটিশ এম. জি.), মিস..নূরজাহান ইউসুফ, শ্রীমতী কমলাদেবী, দেবী চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ। বীরেশচন্দ্র এই অনুষ্ঠানে সর্বক্ষণ অনুপ্রেরণা দেন। বীরেশচন্দ্র ও তার সঙ্গীরা তাঁরা কোনও বৃটিশ বা অন্য ইউরোপিয়ানরা কম্যুনিস্টদের অনুগামী না হয়েও তাঁদের সাহায্য চান ভারতের মুক্তির জন্য। বীরেশচন্দ্র বলেন ভারতের মুক্তির জন্য ভারতীয়দেরই সংগ্রাম করতে হবে। কোনও বিদেশী সংস্থার লেজুড় হয়ে চললে মুক্তি আসবে না।

১৯৪৩ খৃস্টাব্দে বাংলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে ড. বীরেশচন্দ্র গুহ ঘাস ও পাতা থেকে খাদ্যপ্রাণ পৃথকীকরণে মনোনিবেশ করলেন। মানুষের আহার্যের সঙ্গে এই খাদ্যপ্রাণ সংমিশ্রণের তিনি নানা উপায় উদ্ভাবন করলেন। ড. গুহ গমবীজ, লিভার ইস্ট থেকে বি ১ ও বি ২ খাদ্যপ্রাণ পৃথকীকরণে সাফল্য লাভ করেন। ড. গুহ ও তাঁর সহকর্মীরাই গাছপালায় এস করবিজেনের সন্ধান পান ও ভুট্টা, চাল ও গমের ভুষি থেকে নায়াসিওজেন পৃথক করার সাফল্য লাভ করেন। প্রাণ রসায়নের ক্ষেত্রে অ্যাসকরবিক অ্যাসিডের প্রয়োগ গবেষণার এক নতুন দিগন্ত খুলে দেয়। প্রাণীদেহ কোষে ডিগ্লুকোজ রনোল্যাকটোন হতে আসে গুলানোল্যাকটোন-এর মাধ্যমে খাদ্যপ্রাণ সি জৈব সংশ্লেষণ ড. বীরেশচন্দ্র গুহ ও তাঁর সহকর্মীদের অন্যতম বিশেষ অবদান। তাঁর অন্যতম উল্লেখযোগ্য কাজ জীবদেহে বৃক্ক (কিডনি) ও যকৃৎ (লিভার)-এ জৈব অনুঘটকের বিবর্ধন ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বীরেশচন্দ্রের অবদান। অ্যাসকরবিক অ্যাসিড ও জৈব সংশ্লেষণের উপর তাঁর মৌলিক অনুসন্ধান প্রাণ রসায়নের মধ্যবর্তী বিপাকক্রিয়ায় এক নতুন অধ্যায় সংযোজন করে।

১৯৪৩ খৃস্টাব্দে বাংলায় দুর্ভিক্ষ তাকে বিচলিত করে— তিনি গাছের পাতা ও প্রধানত ঘাস থেকে প্রোটিন প্রস্তুত সম্বন্ধে গবেষণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন।

১৯৪২ খৃস্টাব্দে ড. গুহ সায়েন্স কলেজে ১৯৪২-র আন্দোলনে গুপ্ত ঘাঁটি তৈরি করেন। তাঁর ছাত্ররা এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেন। ড. গুহ ছিলেন এঁদের প্রেরণা। এই সময় নানাদেশের গেরিলা যুদ্ধ বিষয়ক প্রচার পুস্তিকা সরবরাহে তিনি সক্রিয় অংশ নেন। তিনি এ ব্যাপারে নিজে অর্থ দেন ও অর্থ সংগ্রহ করেন।

তখন কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে বিপ্লবীদের যে বেতার প্রচার হোত তার স্থান ছিল ড. বীরেশচন্দ্র গুহর ল্যাবরেটরী।

ভারতে বিজ্ঞান সাধনার এবারে তার অবদান বিরাট। সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চে যুক্ত, ভারতীয় সায়েন্স কংগ্রেস সংগঠনের কার্যকরী পরিষদ ও জাতীয় সায়েন্স ইনস্টিটিউটের সক্রিয় সদস্য। রসায়ণ গবেষণা কমিটির চেয়ারম্যান, পুষ্টি বিষয়ক গবেষণা কমিটির চেয়ারম্যান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স ফ্যাকালটির তিনি ডিন। ১৯৬৪ খৃস্টাব্দে ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসের সভাপতি।

স্বাধীনতার পর দেশগঠনের জন্য বিজ্ঞানের উন্নতি ও ছাত্রগোষ্ঠীর গবেষণার কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করে জীববিজ্ঞানে বসু মৌলিক গবেষণা করেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সঙ্গে গবেষণাকালীন তিনি কোনও বৃত্তি পেতেন না (তখন বৃত্তি ছিল না)। টিউশনি করে গবেষণা করতেন। বই মাথায় দিয়ে সায়েন্স কলেজে আচার্য রায়ের কথা অনুসারে থাকতেন।

আচার্য রায়ের মতোই ড. বীরেশচন্দ্র গুহর সায়েন্স কলেজ ও বাড়ি ছাত্রদের জন্য, গবেষকদের জন্য উন্মুক্ত ছিল।

ভারতে বিজ্ঞান সাধনার প্রসারে ও প্রচারে অগ্রণী বীরেশচন্দ্র কিছুকাল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। তাঁর স্ত্রী ড. ফুলরেণু গুহ এবং সমাজসেবিকা ও স্বাধীনতা সংগ্রামী।

ড. বীরেশচন্দ্র গুহর জীবনে মহাবিপ্লবী দেশবরেণ্য নেতা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবদান অনস্বীকার্য— তিনি না থাকলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত রসায়ন বিভাগে অধ্যাপক হয়ে যোগদান করতে পারতেন না এবং তাঁর অগ্রগতি ব্যাহত হোত। তাঁর আবির্ভাবের একশ আট বছরে তাঁকে ও তাঁর বিজ্ঞান সাধনা ও জাতীয়তাবাদী কার্যকলাপের জন্য তাঁকে আমরা সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

সত্যানুসন্ধান করতে গিয়ে যে প্রসঙ্গগুলি প্রচলিত ও প্রচারিত ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে চলে গেল—এমন ১১টি প্রবন্ধের সংকলন।

ভারত বনাম ইন্ডিয়া

—ঃ সম্পাদনা ঃ—
অমলেশ মিশ্র
মূল্য : ২০০ টাকা

—ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ—
দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কোলকাতা-৭০০০৭৩

Sharada Travels

ভ্রমণ পিপাসু বাঙালীর নির্ভরযোগ্য সঙ্গী

শারদা ট্রাভেলস্

উলুবেড়িয়া, হাওড়া

প্রত্যুষ মণ্ডল– 9874398337 / 8820329463

❁ গ্যাংটক-নামচি-পেলিং-ইয়ুমথাং ❁ দার্জিলিং ❁ পুরী
❁ সিমলা-কুলু-মানালী ❁ কাশ্মীর ❁ ভাইজ্যাক-আরাকু
❁ দিল্লি-আগ্রা-মথুরা-বৃন্দাবন-হরিদ্বার-মুসৌরী
❁ কেরালা ❁ গোয়া ❁ মুম্বাই ❁ আন্দামান
❁ দেওঘর ❁ সুন্দরবন ❁ সিমলীপাল
❁ শিলং-চেরাপুঞ্জি-গৌহাটি

প্যাকেজ ট্যুরের জন্য যোগাযোগ করুন।

সীমান্ত প্রণাম

সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে গত ২১ ও ২২ নভেম্বর মালদা জেলাতেও এফ আই এন এস (ফিনস্)-এর উদ্যোগে ‘সীমান্ত প্রণামের’ কার্যক্রম প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে সমাপ্ত হলো। মালদা জেলার ১৫০ কিমি বাংলাদেশ সীমান্তে ৫টি সীমান্ত চৌকি যথা ময়নাকলা খুটাদহ থেকে পার্বতীডাঙ্গা, আগ্রাহরিশচন্দ্রপুর থেকে তিলাসন, কলাইবাড়ী থেকে আদমপুর, কুস্তিরা থেকে মিলিক সুলতানপুর ও জহুরাতলা থেকে মহদীপুর সীমান্ত পর্যন্ত পায়ে হেঁটে পরিক্রমা করেন যুবকরা। ৭৯ জন যুবক দেশের ৭টি বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছেন। রাজ্যগুলি হলো— ওড়িশা, পাঞ্জাব, কর্ণাটক, বিহার, রাজস্থান, কেরল, মধ্যপ্রদেশ ও তামিলনাড়ু থেকে ১৫০টিরও বেশি গ্রামে ফিনস্-এর যুবকরা গিয়ে সমীক্ষা করেন। ২২ তারিখ দুপুর ১১টা থেকে ১০ মিনিটের জন্য ৫টি স্থানে মানব শৃঙ্খলের ব্যবস্থা করা হয় এবং ৫টি স্থানে ২৫০০ এর বেশি সীমান্তবাসী হাতে হাত ধরে সীমান্ত সুরক্ষার শপথ গ্রহণ করেন। সারা দেশের পবিত্র নদীর জল দিয়ে সীমান্তে প্রহরারত নিহত জোয়ানদের প্রতি অভিষেকের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

সীমান্তবর্তী বি এস এফ ক্যাম্প থেকে পদযাত্রায় সামিল ফিনস্-এর যুবকদের চা ও জলযোগ দিয়ে আপ্যায়িত করা হয় এবং এইরকম কার্যক্রমকে স্বাগত জানানো হয়। সীমান্তে বসবাসকারী মানুষদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে এই সমীক্ষা অনেক মূল্যবান বলে মনে করা হচ্ছে এবং আগামীদিনে দেশের সীমান্তকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে এই রূপ অভিনব কার্যক্রম আরও বলে বি এস এফ-এর পক্ষ থেকে সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের রিষড়া গ্রামীণ খণ্ডের উদ্যোগে হুগলীর কোন্নগরের নিকটস্থ নবগ্রামে নবমীতে বুকস্টল দেওয়া হয় এবং বিজয়া দশমীর দিন অস্ত্র-পূজার কর্মসূচী নেওয়া হয়।

ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প

স্বস্তিকার দীর্ঘদিনের গ্রাহক এবং সঙ্ঘের শুভানুধ্যায়ী বাপি ভট্টাচার্য তাঁর পিতা স্বর্গীয় শুভেন্দু ভট্টাচার্য ও স্বর্গীয়া স্ত্রী পম্পা ভট্টাচার্যের

স্মৃতির উদ্দেশে প্রতি বছরের মতো এইবারও ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প ও রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছিলেন মালদা শহরের ২নং কলোনীর কিশোর সঙ্ঘের প্রাঙ্গণে। গত ১৬ নভেম্বর এই রক্তদান শিবিরে ৪০ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন যার মধ্যে ১৫ জন মহিলা ছিলেন। এছাড়া মালদা সদর হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগের ডাক্তারা ফ্রি ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে ২৫ জন রুগীকে ঔষধ-প্রদান করেন। উল্লেখ্য স্বর্গীয়া পম্পা ভট্টাচার্য একমাত্র পুত্রসন্তান প্রসব করার পর পরই সেপ্টেসেমিয়া রোগে ডাক্তারের ভুল চিকিৎসায় অকালে ৬ বছর আগে মারা যান। তাঁর মৃত্যু দিনটি স্মরণীয় রাখার জন্য এই রকম সেবা কাজ করা হয় এবং প্রতিবেশীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাতে সহযোগিতা করে থাকেন।

মঙ্গলনিধি

পুত্র অগ্নিবেশ ঝাঁ চক্রবর্তীর বিবাহ উপলক্ষে জলপাইগুড়ির স্বয়ংসেবক প্রবোধ ঝাঁ চক্রবর্তী এবং তাঁর স্ত্রী দীপ্তি ঝাঁ চক্রবর্তী সঙ্ঘের প্রচারক পার্থ ঘোষের হাতে তিন হাজার টাকা মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন।

হিলি সীমান্ত দিয়ে অবাধে চলছে গোমাংস পাচার

অজয় কান্তি সরকার, বালুরঘাট ।। গ্রামের নাম বলোপাড়া। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি থানার ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমানা স্থিত একটি প্রত্যন্ত গ্রাম। গ্রামের প্রায় একশ' শতাংশ লোকই

গোমাংস ভর্তি বস্তা কাঁধে নিয়ে পাচারকারীরা।

তথাকথিত সংখ্যালঘু শ্রেণীর। অধিকাংশ লোকের জীবিকা কৃষি হলেও তা শুধু দেখানোর জন্য। বস্তুত এখানকার লোকের মূল জীবিকা বিভিন্ন দ্রব্য ভারত থেকে বাংলাদেশে বা বাংলাদেশ থেকে ভারতে পারাপার করা অর্থাৎ চোরাকারবার। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র থেকে শুরু করে গোরু, মহিষ পর্যন্ত পারপার করতে সিদ্ধহস্ত এইসব লোক। শুধু তাই নয় হিলি থানার উঁচু ও নীচু গোবিন্দপুর, আপ্তর, হাঁড়িপুকুরসহ কাঁটাতার সংলগ্ন বেশিরভাগ গ্রামগুলিরই একই পরিস্থিতি। এই সব গ্রাম থেকে একসঙ্গে একশ দেড়শ' লোক ধারালো অস্ত্রসহ পারাপার করতে আসে। ফলে সীমান্তরক্ষী বাহিনীরও বাধাদানে প্রাণ সংশয়ের সম্ভাবনা থাকে।

সম্প্রতি ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে সুসম্পর্কের নিরিখে কেন্দ্র সরকারের তরফ থেকে বি এস এফের ওপর কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। আর যত গণ্ডগোল এখান থেকেই শুরু। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বি এস এফ বলেন, আমরা দুই চার জন জওয়ান একশ দেড়শ' পাচারকারীকে কীভাবে সামলাবো? কারণ পাচারকারীরা জানে আমরা ওদের ওপর গুলি চালাতে পারব না।

কাঁটাতার ডিঙিয়ে গোটা একটা গোরুকে পার করা কঠিন। সে জন্য গোরুটিকে কেটে ছোট ছোট বস্তায় ভর্তি করে সেই বস্তাগুলিকেই কাঁটাতারের ওপর দিয়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে এইসব লোক। ওপারেও বস্তাটিকে সংগ্রহের জন্য বসে থাকছে লোক। বলোপাড়া গ্রামের এক যুবক সইদুল মণ্ডল জানায়, বাইরে থেকে গোরু আনা হয় এই গ্রামে। তারপর গ্রামেই কাটা হয় গোরুটিকে। ছয় কেজি হিসাবে বস্তা তৈরি করা হয়। ভারতে ছয় কেজি এই বস্তার দাম যেখানে ৬০০ টাকা পড়ে, সেখানে বস্তাটিকে ওপারে পার করতে পারলেই তার মূল্য হয়ে যায় ভারতীয় মূল্যে ১৫০০ থেকে ১৬০০ টাকা। ফলে ছোট বড় সব ধরনের লোক এই কাজে ব্যস্ত। স্থানীয় সূত্রে খবর, কাঁটাতারের ওপারে অবস্থিত ভারতীয় গ্রাম নিচু গোবিন্দপুরের জিয়ার মণ্ডল এই অবৈধ পারাপারের মূল হোতা। গোরুকে কাটা থেকে শুরু করে তাকে প্যাকেট ও ক্যারিয়ার ঠিক করা সবকিছুই ঠিক হয় তারই অঙ্গুলি হেলনে। হিলি থানার ওসি সৌম্যজিৎ রায় জানান, আমরা বেশ কয়েকবার ওই গ্রামে হানা দিয়েছি ও নিষিদ্ধ মাংস উদ্ধার করেছি। প্রাথমিকভাবে কিছুদিন এই অবৈধ কাজ বন্ধ থাকলেও কিছুদিন পর তা আবার শুরু হয়ে যায়। গত বছর আমরা শুধু অবৈধ গোরু নিলাম করেই ছত্রিশ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে দিই। ৯৬ নং ব্যাটেলিয়ানের কমান্ড-ইন-চার্জ রাজেন সুদ-এর বক্তব্য— বর্তমান সরকারের নীতি অনুযায়ীই আমরা কাজ করছি। আমাদের জওয়ান যথেষ্ট সক্রিয়। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জেলাশাসক দুর্গাদাস গোস্বামী বলেন, গোরু কাটার ব্যাপারটি অত্যন্ত নিন্দনীয়। আমি বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে দেখছি।

রাজা উলঙ্গ!!
ছিঁড়ে যাক মিথ্যার জাল!!
অবসান হোক বিড়াল তপস্যার!!

একুশ শতকের সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর বই!
বিপ্লবী প্রাবন্ধিক রুদ্রপ্রতাপ চট্টোপাধ্যায়ের

মহর্ষি হরিনাথ মজুমদার

ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মানুষ

দাম : দু-শো টাকা

তুহিনা প্রকাশনী
১২ সি বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩,
ফোন : মোবাইল-৯৮৩০৫৩২৮৫৮

অখিল ভারতীয় ইতিহাস সংকলন যোজনার নবম রাষ্ট্রীয় অধিবেশন

দেশের সমৃদ্ধ পরম্পরার অনুরূপ ইতিহাস রচনার আহ্বান

নিজস্ব প্রতিনিধি।। অখিল ভারতীয় ইতিহাস সংকলন যোজনার নবম রাষ্ট্রীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলো মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রে গত ২৬-২৮ অক্টোবর। অধিবেশন শুরু হয় ২৬ অক্টোবর। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক শ্রীমোহনরাও ভাগবত, মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিংচৌহান, প্রকল্পের জাতীয় অধ্যক্ষ ড. শিবাজী সিংহ, জাতীয় কার্যাধ্যক্ষ ড. সতীশচন্দ্র মিত্তল, জাতীয় সংগঠন-সচিব বালমুকুন্দ পাণ্ডে এবং গোয়ালিয়রের জীবাজী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার এবং স্থানীয় সচিব ড. আনন্দ মিশ্র প্রদীপ জ্বালিয়ে অধিবেশনের সূচনা করেন।

সূচনায় ড. সন্তোষ শুক্ল সংকল্পবাক্য পাঠ করেন। তারপর জাতীয় সংগঠন-সচিব বালমুকুন্দ পাণ্ডে মঞ্চে আসীন সমস্ত অতিথির পরিচয় করানোর সঙ্গে সঙ্গে দেশজুড়ে ইতিহাস সংকলন কাজে যুক্ত প্রতিনিধিদের স্বাগত জানান।

এরপর মঞ্চস্থ অতিথিরা পাঁচটি গ্রন্থ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেন। গ্রন্থগুলি হলো ড. ঠাকুরপ্রসাদ বর্মা সম্পাদিত 'লোকায়তনম্', ড. সতীশচন্দ্র মিত্তলের লেখা' রাষ্ট্রীয় চৈতন্যকে প্রকাশমে ভারতকা স্বাধীনতা সংঘর্ষ, ড. ঠাকুরপ্রসাদ বর্মা সম্পাদিত 'বিভূতিম, যুগযুগীন রায়সেন' এবং ড. তেজ সিং সৈন্ধবের লেখা 'যুগযুগীন দেবাস'।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিংচৌহান। তিনি বলেন, ভারত এক অত্যন্ত প্রাচীন ও মহান রাষ্ট্র। আমাদের ঋক্‌বেদ কমপক্ষে দশ হাজার বছরের প্রাচীন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় হলো আমরা কী ছিলাম তা নিজেদের দৃষ্টিতে না দেখে ইংরেজের দৃষ্টিতে দেখছি।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক শ্রীমোহনরাও ভাগবত। বলেন, ইতিহাস সংকলন প্রচেষ্টার এই সম্মেলনে যেসব তথ্য

সামনে এসেছে তা ছাপার অক্ষরে সংকলন করে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার সংকল্প নিতে হবে। তিনি বলেন, ইংরেজরা ভারতের ইতিহাসকে নিজেদের মতো ভেঙেচুরে তৈরি করেন এবং সেটাই সকলে পড়ে। এটা ঠিক নয়। এদিকে দৃষ্টি দিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে ভারতের সমৃদ্ধ পরম্পরাকে তুলে ধরতে হবে ইতিহাস রচনার মাধ্যমে। সারা পৃথিবীকে রক্ষার জন্যে যে শক্তি প্রয়োজন তা আর কারও নেই, শুধু রয়েছে আমাদের সনাতন হিন্দু-সংস্কৃতির মধ্যে। এমনকী শ্রীঅরবিন্দ পর্যন্ত লিখেছেন ঈশ্বরও চান সনাতন ধর্মের উত্থান হোক। ভারতের পরিচয় আমাদের সনাতনধর্ম।

রাষ্ট্রীয় ভাবনার কথা ব্যাখ্যা করে শ্রীভাগবত বলেন, পৃথিবীতে এমন কোনও দেশ নেই যার জাতীয়তা নিয়ে কোনও সংকোচ আছে। পৃথিবীতে শুধু ভারতই ওইরকম দেশ— যার জাতীয়তা নিয়ে প্রশ্ন করা যায়। যদি আমরা সংস্কৃতিকে কালচার বলি ধর্মকে রিলিজিওন বলি তাহলে জাতীয় ভাবনা জাগবে না। যে নিজস্ব সংস্কৃতি আমরা তৈরি করতে চাই, আমাদের নিজেদের দৃষ্টিতে, নিজস্ব কথায় সেই ভারতকে উপলব্ধি করা দরকার। আমাদের পুরাণ আর কাহিনি পড়াও বেশি চাই।' তিনি বলেন, জনমানসকে 'ডি-কলোনাইজেশন' করায় উদ্যোগী বিদেশীদের চাপিয়ে দেওয়া মানসিকতা দূর করা জরুরি।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন অধ্যাপক আনন্দ মিশ্র। সম্মেলনের উদ্বোধনী পর্বের সমাপ্তি হয় শ্রীযুক্ত আগরওয়ালের গাওয়া রাষ্ট্রীয় গীত 'বন্দেমাতরম' গানের মধ্যে দিয়ে।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে নির্দিষ্ট ছিল বিভিন্নজনের গবেষণাপত্র পড়ার জন্যে। অনেকে তাতে অংশ নেন।

শেষ দিনের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ-সরকার্যবাহ সুরেশ সোনী। তিনি বলেন, ভারতের জাতীয়তার নিজস্ব ইতিহাস আছে। তার প্রভাব কমবেশি হতে পারে, কিন্তু ধারা ছিন্ন হয়নি। অতীতের নিজস্ব মহত্ত্ব আছে। আজকের ইতিহাস গত কালে রয়েছে। বর্তমান সমস্যার কথাও অতীতের মধ্যে রয়েছে। নিজেদের অতীতকে জানা আজকের ও আগামী প্রজন্মের কাছে অত্যন্ত জরুরি।

তিনি বলেন, অতীতকে বিচ্ছিন্ন করে জীবনপ্রবাহ চলে না। ভারতকে ভারত হয়ে ওঠার জন্যে ভারতকে বুঝতে হবে। ভারতের স্বতন্ত্র নিজস্ব ইতিহাস আছে। প্রত্যেক ভারতবাসীকে নিজের চিত্তমধ্যে ভারতের প্রতি শ্রদ্ধা মান-সম্মান রাখা দরকার।

সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করে চাণক্য ও উপনিষদ গঙ্গা ধারাবাহিকের নির্দেশক অভিনেতা ড. প্রকাশচন্দ্র দ্বিবেদী।

যোগে রোগ মুক্তি

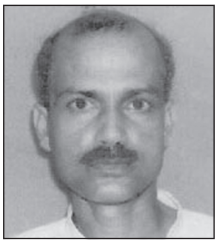

আশীষ পাল

নাড়ি সম্পর্কিত আলোচনা :

সংস্কৃত নাড় ধাতু থেকে নাড়ি শব্দটি এসেছে। এর অর্থ প্রবাহিত হওয়া বা গতিশীল হওয়া। মানবদেহে অসংখ্য নাড়ি আছে, হঠযোগ প্রদীপিকায় ৭২,০০০ হাজার নাড়ির বর্ণনা আছে তার মধ্যে প্রতিটি নাড়ির কিছু না কিছু কাজ আছে। তার মধ্যে ১৪টি নাড়ি প্রধান। যোগ শাস্ত্র এই ১৪টি নাড়ির মধ্যে ৫টি নাড়িকে প্রাধান্য দিয়েছে।

(১) **সুষুম্না নাড়ি :** এটি নাড়ির মধ্যে প্রধান। দেখতে মোটা দড়ির মতো। নাড়িটি মূলাধার থেকে শুরু হয়ে মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে ব্রহ্মরন্ধ্রে বা সহস্রারে প্রবেশ করেছে।

(২) **ইড়া নাড়ি :** সুষম্না নাড়ির বাঁ দিকে ইড়া নাড়ি। এর অপর নাম চন্দ্র নাড়ি।

(৩) **পিঙ্গলা নাড়ি :** সুষুম্না নাড়ির ডান দিকে পিঙ্গলা নাড়ি, এর অপরনাম সূর্য নাড়ি।

(৪) **কুহু নাড়ি :** জননেন্দ্রির অঞ্চলে ও গুহ্যদ্বারে এর অবস্থান।

(৫) **শঙ্খিনী নাড়ি :** এর অবস্থান জননেন্দ্রিয় অঞ্চলে ও গুহ্যদ্বারে।

অন্যান্য নাড়ি : এগুলির অবস্থান সারা শরীরে। এরা দেহকে পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

ষট চক্রের অবস্থান :

যোগ সাধকের মূল লক্ষ হলো কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগিয়ে তোলা। তার জন্য যোগীকে ৬টি চক্র অতিক্রম করতে হবে। যার দ্বারা সাধক দিব্য চেতনা লক্ষস্থলে পৌঁছাবে। এই ৬টি চক্রকে বলা হয় ষটচক্র।

(১) **আজ্ঞা চক্র :** এর অবস্থান দুই ভ্রূরুর মাঝখানে। দলের বা পাপড়ির সংখ্যা ২টি।

(২) **বিশুদ্ধ চক্র :** এর অবস্থান কণ্ঠ মূলে। দলের সংখ্যা ১৬টি।

(৩) **অনাহত চক্র :** এর অবস্থান হৃদয়ে। দলের সংখ্যা ১২টি।

(৪) **মণিপুর চক্র :** এর অবস্থান হৃদয়ের নীচে অর্থাৎ নাভিদেশে। দলের সংখ্যা ১০টি।

(৫) **স্বাধিষ্ঠান চক্র :** এর অবস্থান লিঙ্গমূলে। দলের সংখ্যা ৬টি।

(৬) **মূলাধার চক্র :** এর অবস্থান মেরুদণ্ডের শেষ প্রান্তে অর্থাৎ কন্দস্থানে। দলের সংখ্যা ৪টি।

আজ্ঞা চক্রের উপরে অর্থাৎ ব্রহ্মতালু। সেখানে আছে সহস্রার বা সহস্রদল পদ্ম।

মেরুদণ্ডের বাঁদিকে ইড়া। মধ্যে সুষুম্না ও ডানদিকে পিঙ্গলা বিরাজমান। সুষুম্না একটি অতি সূক্ষ্ম, জ্যোতির্ময়, সূত্রকার ও প্রাণময় পথ মেরুদণ্ডের পথে যার অবস্থান। মুক্তির এই পথ দিয়েই কুণ্ডলিনীকে ঊর্ধ্বদিকে চালিত করতে হয়। ব্রহ্মতালু, সহস্রদল বিরাজ করেন। একমাত্র যোগীরাই যোগ প্রভাবে এই সমস্ত নাড়ি সম্বন্ধে সবিশেষ জানতে পারেন শুধু নয়, অনুভবও করেন।

কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী শতবর্ষ উদ্‌যাপন সমিতি

—সমাপ্তি অনুষ্ঠান—

১১ই ডিসেম্বর '১২, সন্ধ্যা ৫.৩০ মিনিট

মহাজাতি সদন

—: *প্রধান অতিথি ও বক্তা* :—

পূজনীয় মোহনরাও ভাগবত

সরসঙ্ঘচালক, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ

বিশেষ অতিথি : পূজ্যপাদ দেবানন্দ ব্রহ্মচারী

রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
সভাপতি

প্রণব রক্ষিত
সাধারণ সম্পাদক

সকলের সবান্ধব সানুগ্রহ উপস্থিতি কামনা করি

বোর্ড তাহলে নির্বাচকদের তুলেই দিক

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

বছরে ৬০ লক্ষ টাকা পারিশ্রমিক দিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের দণ্ডমুণ্ডের কর্তারা নির্বাচকদের হাতের পুতুল করে নিয়েছেন। আরও ভালভাবে বললে বোর্ড প্রেসিডেন্ট শ্রীনিবাসনের অঙ্গুলিহেলনেই চলছে বি সি সি আই নির্বাচকমণ্ডলী। না হলে কেন সারা দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উইকেট পেয়েও অশোক দিন্দাকে জাতীয় দলের বাইরে থাকতে হয়? ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে একদিনের ম্যাচে শতরান, কলম্বোয় এশিয়া কাপে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে হাফ সেঞ্চুরি বা দরকারে ব্রেক থ্রু বোলার হিসেবে ৫ উইকেট নিয়েও ম্যাচের পর ম্যাচ বসে থাকতে হয় মনোজ তেওয়ারিকে! যদিও মনোজের যা টেকনিক তাতে শুধু ওয়ান ডে ক্রিকেট নয়, টেস্ট ক্রিকেটেও সফল হওয়া সম্ভব। কিন্তু কে বলবে, লড়বে এদের হয়ে?

অশোক দিন্দা

মনোজ তিওয়ারি

যখন সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্বাঞ্চল থেকে জাতীয় নির্বাচক ছিলেন, তখন সৌরভের জন্য গলা ফাটিয়ে তাঁকে জাতীয় দলে ঢুকিয়ে ছেড়েছিলেন। তারপর সৌরভ ভারতীয় দলে অপরিহার্য সদস্য হয়ে ওঠেন নিজগুণে। পরে ভারতীয় দলের দায়িত্ব নিয়ে অন্য উচ্চতায় নিয়ে যান। কিন্তু সম্বরণ উৎপল চ্যাটার্জি বা দেবাং গান্ধীর জন্য সেভাবে সোচ্চার হননি বোর্ডের দল নির্বাচনী সভায়। দেবাং টেস্ট খেলেছেন তিনটি, উৎপল একটাও নন। নামমাত্র ২-৩টি একদিনের ম্যাচ খেলে উৎপলের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট জীবন শেষ। অথচ অন্য প্রদেশের অতি সাধারণ বহু ক্রিকেটার একের পর এক সুযোগ পেয়ে গেছেন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ পরবর্তীতে দাঁড়িয়েও গেছেন। সম্বরণ যখন নির্বাচক তখন জগমোহন ডালমিয়া বোর্ডের সর্বময় কর্তা। তিনিও বাংলার ছেলেদের জন্য তেমন কোনও উদ্যোগ নেননি। যেমনটা নিয়েছেন পরবর্তী দুই বোর্ড প্রেসিডেন্ট শারদ পাওয়ার বা হালের শ্রীনিবাসন, নিজ রাজ্যের জন্য।

তাহলে কিসের আকর্ষণে বাংলার ছেলেরা ক্রিকেট খেলবে? সাম্প্রতিককালে বাংলা সর্বভারতীয়স্তরে এক উল্লেখযোগ্য অবস্থান নিয়েছে। ২০০৬/২০০৭ পর পর দু'বছর বাংলা রনজি ট্রফির ফাইনালে উঠে অল্পের জন্য চাম্পিয়ন হতে পারেনি। তবে একদিনের রনজি বা ২০-২০ মুস্তাক আলি টুর্নামেন্টে চাম্পিয়ন হয়েছে গত দু'বছরের মধ্যে। পূর্বাঞ্চল টানা দুবার দলীপ ট্রফি জিতল। তারপরও কেন এই বঞ্চনা, অবিচার?

মনোজ, দিন্দা, ঋদ্ধিমান, লক্ষ্মীরতন এরা এখন দেশের মধ্যে সেরা ক্রিকেটার। অথচ বছরের পর বছর সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে অন্য রাজ্যের ক্রিকেটারেরা। পূর্বাঞ্চল নির্বাচক সাবা করিম নির্বাচনী সভায় গিয়ে কি করেন, তা কি কেউ জানতে চায়? আর তাঁর পূর্বসূরী বাংলার রাজা ভেঙ্কটই বা দুটো টার্মে নির্বাচক থেকে কেবলই পকেটভারিই করেছেন, কোনও সদর্থক দায়বদ্ধতা দেখাতে পারেননি।

বছরের পর বছর একই ট্র্যাডিশন চলে আসছে। সেই সুদূর অতীতের সুঁটে ব্যানার্জি থেকে আজকের মনোজ, দিন্দা একই সারণী বা বন্ধনীতে আবদ্ধ। ঠিক করে নির্বাচন পদ্ধতি মেনে চলা হলে সুটে ব্যানার্জি, শ্যামসুন্দর মিত্র, অম্বর রায়, সুব্রত গুহ, গোপাল বসু, সম্বরণ ব্যানার্জি বা সাম্প্রতিককালের উৎপল, লক্ষ্মীরতনরা কম করে হলেও ৩০ থেকে ৫০টি টেস্ট খেলতে পারতেন। শুধু মাত্র পঙ্কজ রায়, দিলীপ দোশী বা সৌরভ গাঙ্গুলিতে আটকে থাকত না বাংলার ক্রিকেট। এই তিনজনই বেশি সংখ্যায় টেস্ট খেলার সুযোগ পেয়েছেন। সুব্রত, অম্বর ৪টি করে, সুঁটে ব্যানার্জি, মন্টু ব্যানার্জি, পুঁটু চৌধুরি ১টি করে আর প্রবীর সেন উইকেটকিপার হিসেবে বেশ কয়েকটি টেস্ট খেলেছেন। শ্যামসুন্দর তাঁর সময়ে দেশের সেরা ব্যাটসম্যান হয়েও দুর্ভাগ্যের শিকার। তাঁরই মতো দুর্ভাগা সম্বরণ ব্যানার্জি, গোপাল বসুরা। সেরা উইকেটকিপার ও অন্যতম সেরা ওপেনিং ব্যাটসম্যান হয়েও ভাগ্য শিঁকে ছেঁড়েনি সম্বরণ, গোপালের। তখন পূর্বাঞ্চল নির্বাচক ছিলেন পঙ্কজ রায়। তিনি এদের জন্য কিছুই করেননি নিজের ছেলে প্রণব রায়কে জাতীয় দলে ঢোকাবেন বলে। প্রণব রঞ্জি, দলীপে ভুরি ভুরি রান করেও ২টি টেস্ট খেলে নিজের জাত চেনাতে পারেননি।

আগে অবশ্য নির্বাচকরা প্রাদেশিক স্বার্থ দেখে দল গড়তেন। তাতে হস্তক্ষেপ করতেন না বোর্ড কর্তারা। এখন যেটা হচ্ছে। নির্বাচকদের শিখণ্ডি করে রেখে শ্রীনিবাসন, রাজীব শুক্লারা নিজের মতামত চাপিয়ে তা আনতে বাধ্য করছে নির্বাচকদের। তাদের সঙ্গে জুটি বেঁধেছেন অধিনায়ক ধোনি। ধোনি শ্রীনিবাসনের চোখের মণি, যেহেতু আই পি এলে তাঁর দলে খেলেন। তাই ধোনি যখন চূড়ান্ত একাদশ নিয়ে মাঠে নামেন তাতে মনোজ, দিন্দার ঠাঁই হয় না। আর টেস্ট সিরিজের জন্য একেবারে ১৫ জনের স্কোয়াড থেকে বাদ।

বাংলার যেসব ক্রিকেট সাংবাদিক দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় দলের সঙ্গে দেশে-বিদেশে ঘুরে ম্যাচ কভার করছেন তাঁরাও তাঁদের কলমে শ্রীনিবাসন-ধোনির অশুভ আঁতাতের বিরুদ্ধে গর্জে উঠে তোড়ফোড় করেন না। তাঁদের এই আশ্চর্যরকম নিশ্চিন্ত থাকার পিছনেও অন্য গল্প আছে। বাংলার বঞ্চিত ক্রিকেটারদের জন্য লড়ার কেউ নেই।

শব্দরূপ-৬৪৮ বৈশাখী গাঙ্গুলী

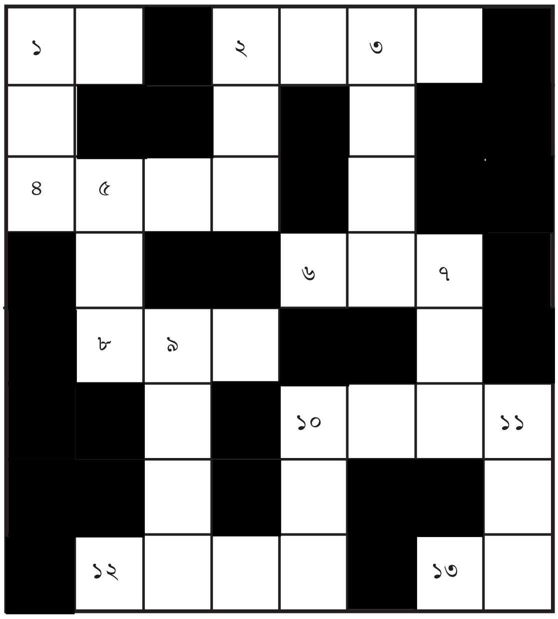

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. তৎসম শব্দে প্রার্থনা, ২. যজুর্বেদ প্রবক্তা ধর্মশাস্ত্রকার ঋষিবিশেষ, একে তিনে গবাদি পশুর খাদ্য, ৪. শিবের জটা, দুয়ে-চারে এক প্রণালী, ৬. তৎসম আগুন, শেষ দুয়ে অতি পরিচিত সাদা পাখি বিশেষ, ৮. দেশি শব্দে কলা গাছের মূলদেশ থেকে যে নতুন চারা বেরোয়, ১০. গোয়ালা, রাখাল, শেষ দুয়ে ইঙ্গ তালা, ১২. দরজায় ঝুলোবার জন্য হংসের মতো লোহার যন্ত্র ১৩. সিন্ধু মুনির পিতা।

উপর-নীচ : ১. পুরোহিত, ২. তৎসম আলতা, শেষ দুয়ে সাদা পাখি বিশেষ, ৩. শ্রীকৃষ্ণের পিতা, ৫. প্রদীপের সলতে, ৭. এই মুনির শাপে সগরবংশ ধ্বংস হয়েছিল, ৯. উপোস, আহারে বিরতি, ১০. যমুনাতীরে এই গ্রামে শ্রীকৃষ্ণ নন্দগৃহে পালিত হয়েছিলেন, ১১. এক মহাকায় দণ্ডকারণ্যবাসী রাক্ষস।

সমাধান
শব্দরূপ-৬৪৫
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

					গো	দা	ন
	দু	র্মু	খ		স্প		ন্দ
ব			গ	র	দ		ন
দ	ম	দ	ম				কা
রি				গ	জা	ন	ন
কা		গো	ম	স্তা			ন
শ্র		মে		নী	হা	র	
ম	গ	দ					

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

 ৬৪৮ সংখ্যার সমাধান আগামী ২৪ জানুয়ারি, ২০১৩ সংখ্যায়

সুন্দরবন ভ্রমণের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

বনভূমি

ট্রাভেলস্

লাক্সারী টুরিষ্ট
ও
মিনি লঞ্চে ভ্রমণ করুন

—ঃ যোগাযোগ ঃ—

মৃগাঙ্ক রায়
ক্যানিং টাউন,
দক্ষিণ ২৪ পরগণা

মোবাইল নং
৯৭৩৪২০৬০৪০

।। চিত্রকথা।। মহাভারত।। ২০

(সৌজন্যে : পাঞ্চজন্য)

কংগ্রেসের মুখে ঝামা

আর পি সিং ক্যাগের প্রাক্তন ডিরেক্টর। যখন কংগ্রেস দুর্নীতির বোঝা নিয়ে ল্যাজে-গোবরে হচ্ছিল, তখন তারা আর পি সিং-কে আসরে নামায়। প্রমাণ করতে চায় টু জি স্পেকট্রাম নিয়ে কোনও দুর্নীতিই হয়নি, সবটাই বিজেপির সাজানো গল্পো। তাই মুরলী মনোহর যোশীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন আর পি। বললেন মুরলী মনোহর যোশী তাকে দিয়ে সই করিয়ে নিয়েছেন। তিনি একজন সরকারি অফিসার। স্বাধীন সাংবিধানিক সংস্থায় কর্মরত। রাষ্ট্রপতির কাছে দায়বদ্ধ ক্যাগের অফিসাররা, অন্য কারুর কাছে নয়। বিজেপি প্রশ্ন তুললো তিনি প্রভাবিত হয়ে সই করলেন কেন? দু' বছরই বা কেন চুপ করেছিলেন? এদিকে পরিকল্পনা মতো কংগ্রেস ও তার দোসর বাজারি কাগজগুলো অপপ্রচার শুরু করে। কংগ্রেসি ম্যানেজাররা যথা দ্বিগ্বিজয় সিং, কপিল, সিব্বাল ও মনীষ তিওয়ারী আসরে নেমে পড়লেন। পাঠকের স্মরণে থাকতে পারে, এরা আন্না হাজারে ও রামদেবের বিরুদ্ধে অতি নিম্নস্তরের ভাষা প্রয়োগ করে ক্ষমা চাইতে বাধ্য হয়েছিলেন। এবার এরা নিজেদের ফেলা থুতু চাটতে বাধ্য হলেন আর পি সিং কাণ্ডেও। শ্রী সিং জানিয়েছেন যে সংবাদমাধ্যমে তার বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করা হয়েছে। যোশী তার উপর প্রভাব বিস্তার করেননি। কংগ্রেসের মুখে ঝামটা ঘষেই দিলেন যেন। তবু কংগ্রেসের শিক্ষা (উচিত?) হলো এমনটা বলা যাচ্ছে না।

বিশ্ব সংবাদ কেন্দ্রে অনুজ ধর

গত ২৩ নভেম্বর কলকাতার সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট স্থিত বিশ্ব সংবাদ কেন্দ্রের কার্যালয়ে নিজের বইয়ের পাওয়ার-পয়েন্ট উপস্থাপনার জন্য আসেন নেতাজী-গবেষক অনুজ ধর। তাইহোকুতে তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনার দিনের ছ' মাস আগে-পরে কোনও বিমান-ই যে দুর্ঘটনার কবলে পড়েনি তাইপে সরকারের কাছে করা অনুজের আবেদনের ভিত্তিতেই তা জানতে পেরেছিল বিচারপতি মনোজ মুখোপাধ্যায় কমিশন। মৃত্যুর কিছুদিন আগে বিচারপতি শ্রী মুখোপাধ্যায় একজন তথ্যচিত্র নির্মাতার কাছে গুমনামীবাবাই নেতাজী বলে দেশজুড়ে বিতর্কের ঢেউ তুলেছিলেন। অনুজও তাঁর বইতে ফৈজাবাদের জনৈক সাধু ভগবানদাসজী নেতাজী হতে পারে, এমন ধারণা পোষণ করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই এনিয়েও বিতর্ক অবশ্যম্ভাবী। তবে শ্রীধর কলকাতায় এসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটা করেছেন তা হলো নেতাজী পরিবারের প্রায় জনা তিরিশ সদস্য নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে দাবি জানিয়েছেন, তিনি যাতে নেতাজী সংক্রান্ত সমস্ত গোপন ফাইল উন্মোচনের জন্য কেন্দ্রের ওপর চাপ সৃষ্টি করেন। বিশ্ব সংবাদ কেন্দ্রে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী জনৈক ভগবানদাসজী-ই নেতাজী, অনুজের এহেন তত্ত্বে সহমত পোষণ না করলেও নেতাজী সংক্রান্ত সমস্ত গোপন ফাইল উন্মোচনে তাঁকে সর্বতোভাবে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন।

বিবেকানন্দ
যুব শিবির : ২০১৩

বিবেকানন্দ যুব শিবির - ২০১৩

অংশগ্রহণের বয়স ১৫ থেকে ৪০ পর্যন্ত

১১-১৩ জানুয়ারি, ২০১৩

স্থান : গয়েশপুর, কল্যাণী, নদীয়া

সৌজন্যে—

আন্তর্জাতিক স্তরে সাফল্যের অভিজ্ঞতায়

স্বদেশীর পথে স্বদেশে ফেরা

লেভিন অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রীজ লিমিটেড

(স্বদেশী চিন্তন বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ)

Swastika RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/048/2010-2012
03 December - 2012

দাম : ৭.০০ টাকা